উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু—

কয়েক ঘণ্টা মাত্র

কয়েক ঘণ্টা মাত্র

অফিসে পৌছতে জামাটা ছিঁড়ে গেল। খদ্দরের পাঞ্জাবি; এক টাকা এগারো আনা। একটু দাম বেশি, আনা চারেক কম হ'তে পারতো—কিন্তু স্বদেশী শিল্প, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি,—অর্থাৎ চরকা, মহাত্মা গান্ধী। জামাটা ছিঁড়ে গেল এক দ্রুতগতি সাইকেলওয়ালার খোঁচায়। দোষ কারো নেই, দৈবদুর্বিপাক। দোষ তার, যার হাতে কেরানি সৃষ্টি, যার হাতে সৃষ্টি সাইকেল-ওয়ালার। জামার তলায় গেঞ্জি ছিলনা, হাতে লাগল লোহার আঁচড়, রক্ত ফুটে উঠল। সামান্য রক্ত, কিন্তু বুকের রক্ত ছিল আরো বেশি,—এক টাকা এগারো আনায় অন্তত ছিল সাতাশ ফোঁটা রক্ত। এ জামা আর সেলাই হবে না, সেলাই করবে কে? স্ত্রী রুগ্ন, সদ্য-প্রসবে নড়াচড়া বন্ধ। আর কে করবে? আর কেউ নেই—ঝি নেই, খানসামা নেই, বাবুর্চি নেই, আয়দালি নেই। থাকতে অবশ্য সবাই পারতো—কিন্তু ভাগ্যের জুয়ায় হার হয়ে গেছে। বড় কল্পনার আদর্শ যাদের মনে মনে, তারা দরিদ্র হয়ে জন্মায়। তারা মার খায় মানুষের উপকার করতে গিয়ে; যারা খেতে পায় না, তাদের সাধ যায় পরকে খাওয়ানো। দরিদ্রের বুকের মধ্যে, কেরানির টুঁটির তলায়, মার খাওয়া পথের কুকুরের প্রাণে জনসেবার এই বিষক্রিয়া কেন?

এই সব উড়ো কথা ভাবতে ভাবতে জীবন অফিসে এসে পৌছল। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আসতে আসতে তৃষ্ণা জেগেছিল,

জুতোর কাঁটা উঠেছিল পটল ডাঙ্গায়, বৌবাজারে কলের জল খেলে, ঈশ্বরকে গাল দিয়েছিল নেবুতলার মোড়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান সোসাইটি কাপড়ের দোকানে দেখে এলো সবুজ বেনারসীতে সোনার ফুলের পাড়, বিড়ি ধরিয়েছিল মাড়োয়ারির গদির সামনে—তারপর এলো অফিসে। ছ' বছর ধরে এই এক পথ। লক্ষ লক্ষ তার পায়ের চিহ্ন, কেরানির কোটি কোটি পায়ের চিহ্ন, অশ্রুর চিহ্ন, হতাশার বিষাক্ত বাতাস, গাড়ীর চাকা মানুষের ক্ষুধাকে মাড়িয়ে চলে, মোটরের কাদার ছিটে লাগে আদর্শবাদীর চিবুকে, আর যায় এই পথ দিয়ে ভিখারীর শোভাযাত্রা, দরিদ্র কেরানির মৃতদেহ, এক টাকা এগারো আনা দামের খড়ের দড়ি বাঁধা খাট। সেই দরিদ্রের মৃত্যু দেখে কাঁদে এই পাড়ার পতিতারা উপরের বারান্দায়।

অফিসে পৌঁছে জীবন ভাবলে, কেরানিরা গাড়ী চাপা পড়ে এমন সংবাদ সে কাগজে দেখতে পায় না। গাড়ীর চাকা তাদের ঘৃণা করে, যক্ষ্মায় মরে তিল তিল। অগণ্য সন্তান আর ছারপোকার কামড়ে তারা মরে, তারা মরে রুগ্ণা স্ত্রীর তিরস্কারে, বেকার ভগ্নি-পতির অত্যাচারে, কুশিক্ষিতা জননীর কুসংস্কারে। সব চেয়ে কুৎসিত মৃত্যু তাদের জীবনে। বেঁচে থেকে মরে, ম'রে গিয়ে বাঁচে। এই ত একটু আগে জীবন বেশ স্ফূর্তিতে ছিল, পান মুখে দিয়ে একটা বিড়ি ফুঁকে বাড়ী থেকে বেরোবার সময় মনে করেছিল, অবস্থাটা তার একটু ভালোর দিকে চলেছে। বড়বাবু খুশি, আগামী বছরে দুটাকা বাড়বে। ধুতি কিনবে একখানা,

সবসুদ্ধ ধুতি হবে চারখানা, একখানা কালাপাড়, একখানা মোহিনী মিলের মিহি জমি। শীতকালে সে একটা গরম কোট করাতে পারতো, আর একটা পুল-ওভর। স্ত্রীর কিছু আছে, পুজোর সময় খুড়শ্বশুরের তত্ব,—শাড়িখানা মন্দ নয়, ছিটের সেমিজ একটা। আর সেমিজ এখন না পরলেও চলে, ব্লাউস-পেটিকোটের কথা আর মতিবীর মনেই পড়ে না। বাঁচা গেছে!—অথচ এই ত একটু আগে জীবনের মনে হয়েছিল ভাগ্যটা বুঝি কিছু সুপ্রসন্ন হ'তে চলেছে। সন্ন্যাসী মাদুলি দিয়ে বলেছে, বত্রিশ বছরে পড়তেই পরের ধন কপালে লেখা, লেখাটা জলজল করছে। রাস্তার লোকও দেখে বলতে পারে, বত্রিশে পরের ধন প্রাপ্তি। করকোষ্ঠি বিচার ক'রে বলেছে, বেরিবেরির ভয় আর নেই, স্ত্রীর মেজাজ ঠাণ্ডা হবে, ছেলেটার ন্যাবা সারবে। বত্রিশ বছর, এখনো অনেক দেরি,—সবেমাত্র ত্রিশ। পরের ধন কোন্ পথ দিয়ে আসবে, কোন্ কৌশলে, তার হদিসটা জীবন জানে না। জানার দরকার নেই, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের চক্রান্তে তার আদর্শবাদ চুরমার হয়ে গেছে, ঈশ্বরের চক্রান্তে তার মতো উচ্চ শিক্ষিত যুবক কেরানিতে পরিণত হতে পারলো,—ঈশ্বরের কুটিল কৌশলের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা। কিন্তু এইবার ঈশ্বরের কৃতিত্বের অগ্নিপরীক্ষা,—হয় তিনি আছেন, নয়ত নেই। থাকলে সে লটারির টাকা পাবে, না থাকলে অন্তত জানা যাবে, আকাশের মুখের দিকে চেয়ে থাকাটা মানুষের কত বড় বোকামি। বোকামি বৈ কি। কেন সে কেরানি হোলো, কেন সে দৈনিক এক টাক

এগারো আনায় দাসখৎ লেখালে? কেন বিয়ে করা? কেন সন্তান হওয়া? বোকা, বোকা। বোকা ঈশ্বরের বোকা সৃষ্টি—সমস্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাশে রয়েছে অনন্ত নির্বুদ্ধিতার আড়ম্বর। এরই বিরুদ্ধে তার অভিযান, এই প্রচলিত সস্তা বিশ্বাসবাদকে সে চূর্ণ ক'রে যাবে। ঈশ্বরের দিক থেকে সে মানুষের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবে, মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের চক্রাঙ্গকে সে বিদ্রূপের আঘাতে বিনষ্ট করবে;—শান্তি প্রচারক যারা, বিশ্বপ্রেমিক যারা, যারা মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়েছে পরম মিথ্যার শৃঙ্খল পায়ে দিয়ে, তাদের মুখোস সে খুলে দিয়ে যাবে। সে জানাবে একই চিতাশয্যায় জঘন্য লম্পটের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমিক পুড়ে ছাই হয়, একই জীবন সংগ্রামে পকেটমারা গুণ্ডার সঙ্গে আদর্শবাদী বিধ্বস্ত হয়, ধর্মবিশ্বাসী আর ঈশ্বর-বিদ্রোহী একই মোটরের চাকার তলায় চাপা পড়ে।

টুলখানা টেনে নিয়ে জীবন কাজে ব'সে গেল। কাজের লোক সে, কাজ না করলে পরিত্রাণ নেই। তার প্রাণের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার দিকে কে তাকাবে, কে সহানুভূতি জানাবে তার বিবর্ণ চক্ষের বিগত যৌবনের প্রতি সহানুভূতি? সত্যি, কাজের লোক হয়েই সে জন্মেছিল। কিন্তু মার খেয়েছে সে অকারণে, অনাদৃত হয়ে রইল সে সংসারে অন্যায়ভাবে—তার এই শোচনীয় মৃত্যুর পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। কোনো যুক্তি নেই রুগ্ন স্ত্রীকে টেনে নিয়ে বেড়ানো, কোনো যুক্তি নেই কুৎসিত সন্তানদের [illegible] বহন করার, কোনো যুক্তি নেই পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-

পরিচিতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখার। সমাজ?—যে-সমাজ তার কল্যাণের দিকে তাকায়নি, তার প্রতি জীবনের মমতা কোথায়? শেষ মূল্য কোন্ চুলোয়? মানব-হিতৈষণার গোড়ায় কথা ত্যাগ। কোন্ মানব তারা? দরিদ্রকে যারা মারে সকল অবস্থায়, আদর্শবাদীকে অপমান করে যারা মদবিক্রমে, পরাধীনের টুঁটির রক্ত যারা খায় কৌতুক-কৌশলে, জাতিদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক যারা অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দিয়ে দুর্বলকে জব্দ করে,—ত্যাগ তাদের জন্য?

খাতাখানা খুলে অক্ষরগুলো জ বন পড়তে লাগলো। অদ্ভুত কাজ তার। কারখানার কতকগুলো মিস্ত্রির নাম, কতকগুলো লোহার যন্ত্রের হিসেব, কয়েকটা ঠিকানা। টাকার অঙ্ক, অঙ্কের পর অঙ্ক, অক্ষরের পর অক্ষর—অনন্ত, অনর্গল। এই অঙ্কের গায়ে তার জীবন-সংগ্রামের রক্তের দাগ, রুগ্ন স্ত্রীর কলহ-বিকৃত মুখ, সন্তানের পিঞ্জরাস্থির আঁচড়। মনে হচ্ছে এই অক্ষরের রেখাচক্রে তার ক্লান্ত বিবর্ণ ভবিষ্যৎ, তার সর্বস্বার্থ আদর্শবাদের মহামরণ, তার সকল আশা ও উচ্চাভিলাষের চিতাশয্যা। এই জীবন যাপন করার ভিতরে তার কোন্ অপরাধ ছিল? কোন্ অপরাধে তাকে ভদ্র-কেরানীগিরি থেকে উৎখাত ক'রে কারখানার এই অধম হিসাব-রক্ষকের কাজে অবনত করা গেলো। তার উচ্চশিক্ষার মূল্য নেই, মনুষ্যত্বের সম্মান নেই, একটা অদ্ভুত দাসত্বের চক্রান্তে তাকে অবমানিত ক'রে বিনিময়ে মাসের শেষে তার মুখের সামনে কয়েক খণ্ড মাংসের টুকরা ফেলে দেওয়া হবে।

সমস্ত কলটার ভিতরে একটা বিরাট সচল লোহার যন্ত্র। সে-যন্ত্রের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা, কড়িকাঠ থেকে মাটিরতলা পর্যন্ত বিস্তৃতি, বিপুল ঘর্ঘর শব্দের ভিতর দিয়ে শত শত চাকা ঘুরছে, বৈদ্যুৎ স্পর্শে সমস্ত লোহার ভিতরে জেগে উঠেছে যেন একটা অশ্রান্ত যন্ত্রণা, যন্ত্রের যন্ত্রণা, মানুষের কপালের ঘামে মসৃণ হচ্ছে লোহার কাঠিন্য—অগণ্য লোহা। নাচছে, পাক খাচ্ছে, ঘুরছে, ডুবছে, দুলছে—বৈদ্যুৎ স্পর্শে নানা বাদপ্রতিবাদশীল যন্ত্রের একটা অদ্ভুত সংঘর্ষ ঘটছে। জীবন ভাবতে লাগলো হয়ত জীবনেও এমনি হয়। কল্যাণ-আদর্শের স্পর্শে ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ, সাদা কালো, ন্যায় অন্যায়, সকল মানুষ, সকল পদার্থ—সমস্ত জড়িয়ে একটা জটিলতা। কিন্তু ছন্দ কোথা রইল? যে-লোহার চাকা তোমাকে নিয়ে যাবে সভ্যতার স্বর্গলোকে, সেই চাকায় দলিত হোলো জীবনের সকল সুন্দর কল্পনা?

জীবন নিজের মাথার চুল টেনে ধরলো। তার হাতে কর্তৃত্ব থাকলে সে এই যন্ত্রের ষড়যন্ত্র ঘুচিয়ে দিতে পারতো। মানবজাতিকে চালনা করা তার পক্ষে কিছু কঠিন হোতো না। অভিভাবকের শক্তি নিয়ে সে জন্মেছিল, ক্রীতদাস হয়ে তাকে মরতে হবে। পৃথিবীর কানে কানে সে বলতে পারতো, এ পথ ভুল। বলতে পারতো, হে বৃদ্ধা, হে জরাপ্রপীড়িতা, আমার হাতে ছিল তোমার নব-যৌবন সঞ্চারের মন্ত্র। কিন্তু দুর্ভাগিনী তুমি, আমার করুণা তুমি পেলে না! এক টাকা এগারো আনা দামের কেরানি না হোলে সে হোতে পারতো একটা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী—

যে-সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। সে কান ধ'রে ঘোরাতে পারতো একটা মহাদেশকে, সামান্য অপরাধে খুন করতে পারতো শত শত মানুষকে একটা সামান্য আজ্ঞায়, রাজাকে রাজ্যচ্যুত করতে পারতো। বলশালী প্রাণশক্তি অবশ্যই তার ছিল, হঠাৎ হয়ে গেল কেরানি, এক টাকা এগারো আনা। আজ তার কোনো মূল্য নেই, তার কারণ সে অমূল্য, অমূল্য বলেই সে বিনামূল্যে বিকিয়ে গেল।

না, আজকে জীবন কাজ করবে না—মাইনে কাটা যাক্। অনেক স্বার্থ সে ত্যাগ করেছে, এক টাকা এগারো আনাও সে সহ্য করবে। আজ সে ব'সে ভাববে পৃথিবীর দুঃখের কথা, মানুষের অনাচারের কথা, প্রাচ্য সভ্যতার কথা, বিশ্বরহস্যের কথা। ইলেকট্রনের গতি, টেলিভিশনের উন্নতি, শব্দ ব্রহ্ম, কালিদাসের কাব্যে অশ্লীলতা, চীন জাপানের যুদ্ধ, জওহরলালের মননশীলতা, আফ্রিকার অরণ্য। সারকুলার রোড, বহুবাজার, ডালহাউসী দিয়ে হাবড়া ষ্টেশন পৌঁছে তুফান মেল, দিল্লী থেকে বম্বে, তারপর 'কন্টিভার্ডি' জাহাজ। জাহাজে সে ক্যাপটেন্। জীবনতরী ভাসিয়ে দাও। আরব সাগর, লোহিত সমুদ্র, ভূমধ্য, দূর অতলান্তিক, দূরান্তরে প্রশান্ত মহাসাগর। তরঙ্গে তরঙ্গে। রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো। দরজা খুলে দাও। শহর, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ,—সাত সমুদ্র, তের নদী। সুদূর বিজন সাগর প্রান্তের মেরুশিরে কোথায় রাজহংসের পক্ষবিধূনন, রেড-ইণ্ডিয়ানদের অনাবিষ্কৃত ভূভাগ পার হয়ে কোথায় সোনার পর্ব্বতের গা বেয়ে

নেমেছে সুবর্ণরেখা, কোন্ অসভ্যজাতি-অধ্যুষিত অরণ্যে অদ্ভুত অনামা জানোয়ারের আনাগোনা, সি[illegible] চেনা নরখাদকের দল—কোথায়? কোথায় তারা? জড়তার চেয়ে অশান্তি ভালো, দুর্বলতার চেয়ে ভালো ঘাত-সংঘাতময় অপঘাত মৃত্যু। সাগরের বুকে ভাসমান জাহাজের উপর থেকে উড়িয়ে নিয়ে চলো উড়ো জাহাজ—যাও দুর্গম কামুস্কাট্কার মৎস্যশিকার ভূমিতে, যাও তুষারময় মেরুদেশে এস্কিমোর ঘরে ঘরে, যাও হাওয়াই দ্বীপের ধারে বিশ্ববিজয়িনী এমিলিয়ার সন্ধানে। বিশ্বের সমস্ত আকাশ ভ'রে নিশ্বাস নেওয়া, সমস্ত সমুদ্র ভ'রে তৃষ্ণা মিটানো, সমস্ত পৃথিবী ভ'রে পদচারণা করা।

*

* *

ঢং ঢং ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজলো। জীবন সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো। কোথায় গিয়েছিল সে? কোথা থেকে ফিরে এলো? কলমটা হাতে নিয়ে সে এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল। ঘণ্টার শব্দে তার চৈতন্য ফিরলো। লোকজন, মিস্ত্রি, কুলি, চাপরাশি, বেয়ারা, ছুটো কেরানি—সকলে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে বেরিয়ে চলেছে। বেলা দেড়টা বাজে। ফোরম্যান্ এসে জীবনের কাছে দাঁড়ালো। বল্লে, চাবিটা দিন্ বাবু' আজ ছুটি হয়ে গেল।

ফোরম্যান্ হাত বাড়ালো। জীবন বললে, ছুটি কে.. ?

আজ রাখিপূর্ণিমা।

হাতে তার রংচঙে রাখি বাঁধা। জরিপাকানো, লাল ফুল, নীল ফিতা, কালো রেশমের ঘুন্টি। জীবন সেইদিকে চেয়ে বললে, সকলেরই ছুটি?

হ্যাঁ—বাবু। আপনি উঠুন, গেট্ বন্ধ হবে।

অনেককাল বৃষ্টির পরে আকাশটায় কোমল নীল রঙ ধরেছে বটে, রোদটা পরিচ্ছন্ন। কে জানে কতদিন প্রকৃতির চেহারাটা চোখে পড়েনি। জীবন যেন ছিল মাটির তলায়, আলোয় আজ উঠে এলো। কাশফুলের মতো কলিকাতা যেন হাসছে, শিউলীর রঙের মতো রোদ। ছুটি হয়ে গেল অসময়ে, এই বেলাটুকু হাতে নিয়ে সে কোথায় যাবে? বাড়ী সে ফিরবে না, পুরনো পরিচিত মুখের প্রতি আর তার মোহ নেই। সে পথে পথে ঘুরবে, রোদের আলোয় আকাশের সুদূর নীলিমার দিকে সে তার অনেককালের বন্ধ ডানা মেলে দেবে। ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী। কোন্ বাঁশী,—কবে বেজেছিল? কোন্ ক্ষুধা জাগিয়েছিল?

…সেও একটা রাখিপূর্ণিমা। সাত বছর আগের সেই ছোট একটা প্রণয়কাণ্ড। সেদিন এত সমারোহ ছিল যে, সামান্যটা চোখে পড়েনি। তবু শেফালীর মতো সেটা ক্ষণস্থায়ী, করুণ গন্ধে মধুর। সেও রাখিপূর্ণিমা। ঠিক মনে নেই, ঠিক মনে রাখার কারণ নেই—তবু তার এই মনোবিকলন ও স্মৃতি আন্দোলনের মূলকেন্দ্রে আজও যে ব'সে রয়েছে, সে যেন অশ্রুর মতো টলটলে, নাড়া দিলেই ঝ'রে যায়, শেফালীর মতো স্বল্পজীবি। আশা ও

আশঙ্কা, মনস্তাপ ও চিত্তচাঞ্চল্য, হৃদয়াবেগ ও বৈরাগ্য—সব ছিল সেই একটি মেয়েকে ঘিরে। চিত্ত-লোকের অবচেতনার অতল অন্ধকারে ডুব দিয়ে জীবন দেখলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মোহ আকুলতার বিন্দুমাত্র লক্ষণও নেই, ভাঙা আসরে বাসি ফুলের একটি পাপড়িও নেই। সাত বছর পরে আজ কেবল রাখিপূর্ণিমার দিনটা মনে পড়ে।

পৃথিবীর পরমায়ু থেকে সেদিনকার সেই রাতটা বিচ্ছিন্ন, সেটা অনৈসর্গিক। গঙ্গায় জ্যোৎস্নার প্লাবন জেগেছিল, পরপারের অস্পষ্ট বনরাজির শীর্ষে যেন মায়ার স্পর্শ, মাঝে মাঝে লাল-সবুজ মাস্তুলের আলো, তার সঙ্গে ছিল ভরা গঙ্গার তটে ঢেউ ভাঙার শব্দ। আকাশের তারারা ছিল ছেলেমানুষীর সাক্ষী। সেদিন রাখিপূর্ণিমা, বন্ধুত্ব বাঁধনের দিন।

রাজগঞ্জ থেকে কলিকাতার দিকে কোন্ একটা স্টীমারঘাট থেকে জীবন স্টীমারে উঠলো। উঁচু বাতাসের তরঙ্গের মতো সেদিনও জীবনের জীবন ছিল অবারিত, বন্ধনহীন। স্টীমারে উঠে আসন নেবার আগে পিছন থেকে নারীকণ্ঠের আহ্বান এলো। —দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কি জানি কি মহালগনে, চাঁদ উঠেছিল গগনে। জীবন মুখ ফিরিয়ে দেখে সবিস্ময়ে বললে, সুললিতা!

সুললিতা বললে, এসো ফার্স্ট ক্লাসে যাই, ওদিকে লোক নেই—দুজনে গেল স্টীমারের নির্জনে।

জীবন বললে, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

গিয়েছিলুম মথুরায়, যোগিনীর বেশে।

হেসে জীবন বললে, পেলে তাঁকে।

পেলুম বৈ কি, যমুনার কূলে পাইনি, পেলুম গঙ্গার তীরে।...
এই বোলে সুললিতা জীবনের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলে।

জীবন মুখ বিকৃত ক'রে বললে, বি-এ পাশকরা মেয়ের মুখে সেন্টিমেন্টের ফেনা!

মেয়েমানুষের গর্ভে যতকাল মানুষের জন্ম হবে ততকাল থাকবে সেন্টিমেন্ট বুকের মধ্যে জমা, আমি এজন্য গর্বিত। ভয় কি? স্বীকার করতে লজ্জা পাও কেন?—সুললিতা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো।

স্টীমার চলতে লাগলো। তরঙ্গে তরঙ্গে। রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো। গোপনচারিণী, ছায়ানুসারিণী। তবু এই একাগ্র আত্মসমর্পণের কাছে নত হওয়ায় ক্ষতি কি ছিল? কেন স্বীকার করেনি?

সুললিতা তার হাত ধ'রে বললে, সংযমের চেয়ে বড় মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় প্রেম। মনে রেখো। আমি প্রাণ দিতে পারতুম, আর তুমি জাত দিতে পারলে না? থাক্, এই নাও। এই রাখী নিয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি সারাদিন। হাত বাড়াও, এই নাও বেঁধে দিলুম চিরকালের জন্যে। বেঁচে থেকেও জানাবো, তোমার জন্যে মরতে পারি।

জীবন তার হাত ধরলে। সুললিতা পুনরায় বললে, এখনো আমরা মা-গঙ্গার কোলে, পৃথিবীর ভূমি এখনো স্পর্শ করিনি।

এই রাখীবন্ধন অক্ষয় হোক,—আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু ব'লে রাখলুম, এই রাখীপূর্ণিমায় তোমার বুকের তট বেয়ে রক্ততরঙ্গ ছুটবে—মনে রেখো, মনে রেখো।

জীবন বললে, স্বীকার করতে পারলুম না তাই তুমি দিয়ে গেলে অভিশাপ?

না, না, না—তুমি দুঃখ দিলে, দুঃখ কিছু নিলে না। তোমার শূন্য ঘট ভ'রে উঠুক, এই প্রার্থনা করি। কিন্তু ওরে অন্ধ, আমি যে সারাজীবন ধ'রে খুঁড়িয়ে হাঁটবো, সেদিকে কি তোমার চোখ নেই?—সুললিতা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে তার পায়ের কাছে ব'সে পড়লো।

* \
* *

স্টীমারের ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে প্রণয়কাহিনীটা অবশ্য মন্দ আরম্ভ হয়নি, বলতে বলতে জীবন অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু অকস্মাৎ পিছন থেকে 'গেল-গেল-এই-এই' শব্দে সে মুখ ফেরাতে যাবে এমন সময় এক হিংস্র জানোয়ার পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করলে।

দিবালোকে কলিকাতার রাজপথে হিংস্র জানোয়ার অবশ্য মোটরকেই বলে। চাকার ধাক্কায় জীবন ছিটকে গেল। পথে হৈ চৈ, লোকে লোকারণ্য। জানোয়ারের হিংস্র দংষ্ট্রার কামড়ে জীবনের পা ভাঙলো।

মোটরখানা অবশ্য পালাতে পারেনি। সেই গাড়ীতেই পথচারীদের সাহায্যে জীবনকে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হোলো। জীবনের তখনো জ্ঞান আছে,—বাঁচবে, কেরানিরা মরে না। সেই অজ্ঞান ও চৈতন্যের পর্দায় তখনো জীবনের ভিতরে রক্তাক্ত গানের কলিটি জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছিল, এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী জীবনের ভার—

বিয়োগান্ত প্রণয়ে গানটি মানায়।

নিমন্ত্রণ

শাড়ীটা ঘুরিয়ে পরতে গিয়ে ভাঙা তক্তার খোঁচা লাগলো হাঁটুতে। নিতান্তই রক্ত বেরিয়ে গেল, আর তারই দাগ লাগলো শাড়ীখানায়। রক্তের চেয়ে শাড়ীর দাম বেশী। শাড়ীখানা তোলা ছিল এমনি কোনো অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের জন্য। অপ্রত্যাশিত বৈকি, কে ভেবেছিল সাতাশ বছর বয়সে নন্দিনী বিয়ে করবে, আর সেই বিয়েতে পুরনো কলেজের বন্ধুদের করবে নিমন্ত্রণ। শাড়ীখানার দাম অনেক, এর পাটে পাটে ছিল কুমারীকালের নানা নিষ্ফল স্বপ্ন। বোটানিকাল্ গার্ডেনের চোরকাঁটা, মধুপুরের পথের রাঙা ধুলোর দাগ, পুরীর সমুদ্রের ওজোন্। হাঁটুটা জ্বালা করছে। রক্তটা সামান্য, জ্বালাটা বেশি। আজকের দিনের রক্তের দাগ থাকুক শাড়ীতে, আজকের জীবন-বিতৃষ্ণা তার পক্ষে অমর হোক! লীলাবতী ভাবতে লাগলো, এই শাড়ীটা গায়ে জড়ালে সে যেন নতুন ক'রে নিজেকে সৃষ্টি করে, নতুন ক'রে ফিরে পায় তার কুমারীত্ব, তার নিষ্কলঙ্ক অতীতকাল।

সেমিজটা ছেঁড়া, ব্লাউসটাই বা ভদ্রসমাজের যোগ্য। তবু ত সব পুরনো। যেমন পুরনো তার এই অসন্তুষ্ট জীবন, যেমন পুরনো মৌখিক ভদ্রতা, যেমন পুরনো তার যন্ত্রণাদায়ক দিবাস্বপ্ন। এই সব প্রাচীনের হাত থেকে তার মুক্তি পাওয়া দরকার। এই ঘর, এই যে দেয়ালের কোণে জটাজটিল উইপোকার অভিযান, এই যে পুরাতন ইঁটকাঠের একটা বদ্ধ গন্ধ, আর এই অতি পরিচিত, অতি

বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা, যার অন্ত নেই, যার প্রতিবিধান নেই—ঈশ্বর, এই প্রাচীনের হাত থেকে শীলাবতীকে মুক্তি দাও। ছেঁড়া সেমিজ হোক, পায়ে একটু আল্‌তা না জুটুক, হাঁটু দিয়ে পড়ুক দু' ফোঁটা রক্ত, কিন্তু অন্তত নতুন ক'রে সৃষ্টি করো দুর্ভাগ্যকে, হানো বজ্র, এনে দাও চরম দুঃখের বন্যা। অন্তত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে শীলাবতী ঝাঁপিয়ে পড়ুক নতুন দুর্যোগে।

আল্‌তা একটু পাওয়া গেল না। রক্তহীন নিষ্প্রভ দুর্ভাগ্য-মাড়ানো দুখানা পা,—তার পা দুখানা দেখলেই মনে হ'তে পারে দারিদ্র্যের চিত্র, শিরা উঠে দাঁড়িয়েছে, মাংস পাতলা হয়েছে—জল ঘাঁটা, বাসনমাজা, ঝি-গিরি করা দুখানা কুৎসিত পা। এই পায়ে আল্‌তার দাগ না দিলে উৎসবের আসরে চল্‌তে লজ্জা করবে। কিন্তু লজ্জাই ত নারীর ভূষণ! যত কিছু লজ্জা,—স্বামীর অকর্মণ্যতার, শাশুড়ীর নীচতার, ননদের গোয়েন্দাগিরির, রুগ্নসন্তান প্রসবের, অনড় অনটন ও দারিদ্র্যের, সমাজের অচল জড়তার, পুরুষের কাপুরুষতার—যত কিছু লজ্জা সবই নারীর ভূষণ। নারীর লজ্জা জীবনে, নারীর লজ্জা মরণে। শীলাবতী ভাবলে, দরকারের সময়ে পায়ে একটু আল্‌তা নেই, ইস্তিরি করা একখানা ভালো শাড়ী নেই, কানের এক জোড়া ঝুম্‌কো নেই,—এমনি ক'রে বাঁচা ভয়ঙ্কর, এমনি ক'রে মরা বিভীষিকাময়।

বাইরে থেকে উৎসবের আমন্ত্রণ তার ভিতরে জাগালো অসন্তোষ; তার অভাব-বোধটা খুঁচিয়ে বা'র ক'রে আনলো। বেশ ছিল সে। চারিটি সন্তানের জননী, রুক্ষ-স্বভাব স্বামী, মুখভারকরা

বড়যন্ত্রপ্রিয় শাশুড়ী, ডাক্তারে-ওষুধে-গাঁদালপাতার ঝোলে, ময়লা বিছানায়, একান্নবর্তী অপগণ্ডের দলে বেশ ছিল সে। নন্দিনীর বিয়ের সংবাদ এলো বিপ্লবের বার্তা নিয়ে, কুমারী জীবনের অনন্ত সুখস্বপ্ন নিয়ে, বঞ্চিত জীবনের অভিসম্পাত নিয়ে। কেন জুটলো না একটু আলতা, কেন নেই পায়ে একজোড়া চটি, কেন গলায় নেই অন্তত দু'ভরি ওজনের একছড়া চেন্। মেয়েদের সম্মান আবরণে আর আভরণে। পুরুষের পৌরুষটাই তার বড় পরিচয়, কিন্তু নারীত্বটা ত নারীর বাহ্য পরিচয় নয়। বয়স বাড়লে পুরুষের আদর বাড়ে, মেয়ের বেলায় উল্টো, দাম যায় কমে। যৌবনই ত মেয়েমানুষের ঐশ্বর্য, বয়সটার জন্যই ত তাদের যত কিছু সমাদর।

কেন গেল সেই বয়স। ঈশ্বর, তুমি বলতে পারো? কেন জোটে না একটু আলতা, কেন এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শাড়ী বা'র করতে হয়, কেন ক্ষয়শীল অধিকারকে ধ'রে রাখার এমন চেষ্টা? এমন ঘর সে কামনা করেনি। ভাঙা কাঠের আয়নার কাছে শীলাবতী দাঁড়ালো—দাড়াভাঙা চিরুণী, তেল চটচটে মাথার ফিতে, দুটো লোহার কাঁটা, 'পতি পরম গুরু' মার্কা সিঁদুর কৌটা—অর্থাৎ এই তার প্রসাধন সামগ্রী। পারা-ওঠা আয়নায় দেখা গেল তার মুখ। কোথায় সেই গৌরব? কেন ঠোঁট কালো হোলো, কেন হোলো দাঁতের গোড়ায় বয়সের দাগ, কেন জাগলো কপালে রেখা, কেন পাতলা হোলো মাথার চুল?

জীবন মথিত ক'রে প্রশ্ন উঠ্‌লো, হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে প্রশ্নটা ধক্

ধক্ করতে লাগলো। বি-এ পাস করার মুখে তার বিয়ে হোলো। উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ আশার চরম পরিণাম হোলো বিয়ে। মিশর দেশের মরুভূমি, প্রাচীন ইংলণ্ডের ডাইনীদের কাহিনী, মেরু-প্রদেশের অসভ্য জাতির জীবন-যাত্রা,—এদের ইতিহাসের পর ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গৃহস্থালী, দুরবস্থার ক্লেদে যে গৃহস্থালী হতমান করে। প্রতিদিনই সে এক ধাপ ক'রে নামছে। উঠতে চেয়েছিল সে নিজেকে ছাড়িয়ে, সাধারণকে ডিঙিয়ে—সকলের মাথার উপর দিয়ে তার মাথাটা হবে দৃশ্যমান। প্রতিদিন সে যুদ্ধ করেছে, প্রতিদিনই তলিয়ে গেছে। ভালো খাওয়া নেই, ভালো হাওয়া নেই, মনের মতো পাওয়া নেই, তবু সে বেঁচে রইলো।

সাজগোজ একটুও তোলো না। শীলাবতী ব'সে রইলো। ঘরে রং-ওঠা চাবি-ভাঙা দুটো তোরঙ্গ, দুখানা ক্যালেণ্ডার, ছেলেমেয়ে-দের কয়েকটা দুরন্তপনার চিহ্ন, পায়া-ভাঙা একটা আলমারী। কেরানির স্ত্রী সে, তার পক্ষে নিমন্ত্রণে যাওয়া চলে না। লেখাপড়া শিখেছিল সে সামান্য কেরানির স্ত্রী হবার জন্য, নোংরা ও রুগ্ন এক পাল ছেলেমেয়ের মা হবার জন্য। এই জীবন কি তার অভিপ্রেত ছিল? ষাট টাকার কেরানির বউ—এক হাতে রান্না, অন্য হাতে বাট্‌না, অন্নবস্ত্রের আশায় অকর্মণ্য স্বামীর মন জুগিয়ে চলা, দুর্মুখ শাশুড়ীর বেতো পায়ে টারপিন্ মালিস করা—এই জন্য কি সে হিষ্টিতে অত বেশি নম্বর পেয়েছিল?

আবার সে উঠলো। তার না গেলেই চলবে না। বহুদিন পরে এই একটা দিন মাত্র, আজ বাইরের আলো এসে পড়েছে তার

জীবনে। দূরের থেকে তাকে কে যেন ডাক দিয়েছে, যেমন শরৎ কালের আকাশ থেকে ডাক দিয়ে যায় শঙ্খচিল। আজ ফাট দিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকেছে দিগন্তের আলো, যে আলো তার অন্ত তন্ত্রের কেন্দ্রকে মাদকরসের মতো উত্তেজিত করেছে। শীলাবতী গিয়ে পুরনো একজোড়া চটি উদ্ধার করলো, মাথার চুলটা ফিরিয়ে নিলে সোজাসুজি, মুখখানা মুছলো ভিজে গামছায়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল শিকল ছিঁড়ে।

বাঁচলো। এমন একটা অখণ্ড মুক্তি তার অনেক কাল হাতে আসেনি। ভুলে যাও অভিশপ্ত আটটা বছর, ফিরে চলো কলেজে। পাঠ্য বইয়ের অক্ষরে অক্ষরে যৌবনের রঙ, বেঞ্চের কাঠের উপর ছুরি দিয়ে কাটা অজানা কোন্ ছাত্রীর হাতের দাগ, বন্ধুদের খোঁপায় কেমন একটা অদ্ভুত সোঁদাল গন্ধ। কলেজ থেকে বাড়ী ফেরা, দুটো রাস্তা বেশি ঘুরে যাওয়া, অবাধ অবারিত জীবন। মনে মনে রাজপুত্রকে ভাবা, মনে মনে সুভদ্রার রথচালনা, মনে মনে কদম্বের মূলে আত্ম-সমর্পণ। জনম জনম হাম ও-রূপ নেহারনু— সেই রূপ! শীলাবতী চলতে চলতে ভাবলো সেই রূপ! চৈত্র পূর্ণিমায় ছাদে শুয়ে আকাশের তারায় জ্বলতো যে-রূপ, যে-রূপ দেখা যেতো গিরিডির মাঠে দাঁড়িয়ে দূরে পরেশনাথের নীল অরণ্যে, যে-রূপ ঝলমল ক'রে উঠতো কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর দিয়ে শরৎকালের শূন্যে।

অনেক দূরে পথ। তা হোক, হাঁটতেই তার ভালো লাগছে। রুগ্ন শিশু যেমন প্রথম হাঁটতে গিয়ে টলমল করে, তেমনি ক'রে

হাঁটা। পথকে অনুভব করা, পৃথিবীকে নূতন ক'রে উপভোগ, জীবনকে প্রতি পদে মাড়িয়ে চলা। হাঁটতে ভালো লাগছে, কারণ এমন ক'রে অনেক দিন হাঁটা হয়নি। আজ স্বামীকে অস্বীকার করতে ভালো লাগছে, সন্তানদের মন থেকে মুছে ফেলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। কারো মৃত্যু সে কামনা করে না, অমঙ্গল সে চায় না—কিন্তু হে ঈশ্বর, তোমার এমন কোনো নিয়ম আছে, যে-নিয়মে তুমি স্বামী ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্য ভোলাতে পারো?

এক পথ থেকে অন্য পথে চললো শীলাবতী। সন্ধ্যার বিলম্ব নেই। ট্রামগাড়ীর ভিতরে, কাপড়ের দোকানে, ডাক্তারখানায়, সিনেমার বারান্দায় আলো জলছে। উৎসব দীপমালায় নগরীর নৈশরূপ রঙে ও রসে যেন টলটল করছে। কিন্তু সে নিজে এর মধ্যে কোথায়? আলতাটুকু যার পায়ে জোটেনি, সামান্য একখানা শাড়ী যার কালের গতির সঙ্গে রুচি মিলিয়ে চলতে পারেনি, তার এখানে কোথায় স্থান? মানুষটা ত আবহমানকালের পুনরাবৃত্তি, রুচি ও জীবনযাত্রার আদর্শটাই ত শুধু গতিশীল! শীলাবতী এর মধ্যে কোথায়? পরিচয়চিহ্নহীন একটা নগণ্য জীবের মতো সে কেন তলিয়ে গেল ধ্বংসের অনর্গল বিপুল প্রবাহের নীচে।

হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেল শহর চোখের সুমুখ থেকে। বাতাসের আগে চললো কল্পনা। নূতন দেশে শীলাবতী উত্তীর্ণ। চারিদিকে মরুভূমি। সেই শস্যহীন ভূভাগের ভিতরে রাজপুতনার দুর্গ। দুর্গ থেকে কামান গর্জে উঠ্‌লো। অদম্য রক্তপিপাসায়

শত শত সেনা ছুটলো শত্রু নিপাতে; প্রাণের মূল্য মুহূর্তে মুহূর্তে যেখানে বিকিয়ে চলেছে—সেই সংহারলীলার ক্ষেত্রে ভীমা-ভয়ঙ্করী লক্ষ্মীবাঈ এলেন অশ্বারোহণে। অতি দ্রুত হত্যার নেশায় অধীর উন্মত্ত। সমস্ত পাপ, সমস্ত অন্যায়কে বিনাশ কর। এক হাতে বল্লা, অন্য হাতে তরবারি। এমনি ক'রে কি উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়েছিল লক্ষ্মীবাঈয়ের মুখ, যেমন এই নৈশ নগরীর পথে যেতে যেতে শীলাবতীর চক্ষু ভয়ঙ্কর দীপ্তিতে জ্ব'লে উঠেছে? এমনি মুখ হয়েছিল কি দেবী সুভদ্রার? এক হাতে বল্লা অন্য হাতে তরবারি। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

এমন একটা মুক্তির মধ্যে দিয়ে শীলাবতী ছুটলো—যেখানে বাঙালী স্বামীর নগণ্য পৌরুষ পৌঁছতে পারে না। এমন একটা শিকলছেঁড়া তীব্র স্বাধীনতা, যেখানে আঁচলধরা অপোগণ্ড বাঙালী সন্তান পথরোধ করতে সমর্থ নয়। চললো শীলাবতী হাবসীদের দেশে। অজানা অনামা হিংস্র শ্বাপদময় অরণ্য, অরণ্যময় পর্বত, পর্বতের দূর দুর্গম গহ্বরের ভিতর থেকে কৃষ্ণকায়া প্রবাহিনী বন্য জন্তুর মতো তাড়না ক'রে আসছে। একা সেখানে শীলাবতী শিলাতলে আসীন। বনবিহারিণী, বিজনবাসিনী। তখনও মানব-সভ্যতার জন্ম হয়নি, তখনও পুরুষ নারীকে স্পর্শ করেনি। সমস্ত প্রকৃতির মর্মকোষে প্রাণপিপাসার যে-চেতনা লুক্কায়িত, শীলাবতী তারই সন্ধানে। তারই সন্ধানে উত্তীর্ণ হোলো পর্বতের পর পর্বত। সেখানে আকাশ কথা বলে পর্বতের কানে কানে, প্রথম সূর্যরশ্মি চুম্বন করে পৃথিবীর প্রথম প্রস্ফুটিত কুসুম-পল্লবে, যার শব্দে ভ্রমরের

তন্দ্রা ভেঙে যায়—সেই পথ দিয়ে অলক্ষিত চরণে লীলাবতী চ'লে গেল।

বেদুঈনের দেশে উত্তীর্ণ। তপ্তরৌদ্রে বালুময় মরুপথে চলে দলে দলে উটের দল। দূর-দিগন্তে নীলাভ পাংশু আবছায়ায় মরীচিকার সঙ্গে মিলে যায় দস্যুকবলিত বন্দিনার লোহার শৃঙ্খলের আওয়াজ। লুন্ঠিত দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে লুন্ঠিতা লীলাবতী। উটের পিঠে ঘেরা-টোপের ভিতরে বোরখা-পরা অজানা দেশের যাত্রী লীলাবতী। বেদুঈন দস্যু প্রহরী, বিশাল, ভয়াল—হিংসায় যার জন্ম, হিংস্রতায় যার দীক্ষা, নিষ্ঠুরতা যার পেশা। এমন সময় বোরখার ভিতর দিয়ে দেখা গেল, বালুরাশি উড়িয়ে আসছে অস্ত্রধারী নাইটের দল। রক্তপাগল বেদুঈনের সঙ্গে বাধলো সংগ্রাম। অনন্ত বালুরাশির মধ্যে মানুষের রক্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপরে? বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা; অশ্বপৃষ্ঠে লীলাবতীকে নিয়ে মধ্যযুগের নাইট্ ছুটলো অজানা দেশ থেকে কোন্ অজানায়। বিজন ভীষণ মানুষের দেশে—দিকে দিকে অতিকায় জানোয়ারের আনাগোনা, নূতন মানব সভ্যতার পত্তন সেখানে আজো হয়নি। জন্তুর ছবি জালিয়ে পাষাণপুরীকে আলোকিত করা হয়, মানুষের কঙ্কাল সাজানো গুহার গর্তে গর্তে, অদৃশ্য বিশালকায় প্রহরীর ভয়াল করাল দৃষ্টি নারীর বুকের মধ্যে কেবল বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

প্রেতিনীর মতো গুহার রন্ধ্রপথে লীলাবতী সেখান থেকে পলায়ন করলো। আবার নূতনতর জীবন। যে-জীবন পরম পিপাসায় থরোথরো। যার আদি নেই, যার অন্ত নেই। পৃথিবীর পথে

আবার অবারিত ছুটে চলা। যে দেশ আজো অনাবিষ্কৃত, যেখা সমাজ সৃষ্টি হয়নি, সন্তানের দায়ীত্ব যে দেশে জননী আজো ব করেনা। বল্কলধারী স্ত্রীপুরুষ, জানোয়ারের মাংসাস্থি কেবল খা বৃক্ষের ফাটলে যাদের আবাসস্থল—সেই সব বন্য নরনারীর মধে কিম্বা অন্য কোথাও। মেরুর দেশে, বরফের গর্ত্তে, মৎস্যব্যবসায়ীদের পরিবারে, এস্কিমোদের সঙ্গে সঙ্গে।

শীলাবতী বড়ই ক্লান্ত। নিজের ভাগ্যকে পরীক্ষা করতে ন পারার হতাশায় ক্লান্ত। একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব সে দেখতে পারলোনা, সে দেখতে পারলোনা দেশ-জোড়া একটা ওলোট-পালট। একটা অন্ধ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক হয়ে তার এই যে জীবনটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল, এর জন্য দায়ী কে? পায়ে তার একটু আলতা জুটলোনা বটে, কিন্তু যারা তার বুকের উপর ব'সে সমস্ত রক্তটা নিংড়ে নিল, তাদের কণ্ঠের রক্তে সে তার চরণ রাঙাতে পারলোনা কেন? সে দরিদ্র ব'লে তার রাগ নয়, কিন্তু তার জীবন পরিপূর্ণ বিকশিত হ'তে পারলোনা, তাই তার আত্মগ্লানি।

*
* *

নন্দিনীর বাড়ীর বাগানে এসে শীলাবতীর ঘুম ভাঙলো। ঘুমই বটে, একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন। পথ অনেকটা দূর নয়, কিন্তু দুঃস্বপ্নটা স্থান ও কালকে বিস্মৃত ক'রে দিয়েছিল। সময়টা

কিছু না, মনের একটা কল্পনা মাত্র। এই ত সে নন্দিনীর বাড়ীর বাগানে বিবাহ উৎসবের মধ্যে এসে পড়লো।

পুরনো বন্ধুরা তাকে চিনতে পারলো। যৌবনই মেয়েদের পরিচয়, তার শারীরিক দৈন্যটা দেখে বন্ধুরা একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। দৈন্যটা তার সর্বাঙ্গে। ভালো শাড়ী নেই, আধুনিক অলঙ্কার নেই, পায়ে আলতা নেই। তবু চিনতে পারলো, আদর ক'রে নিয়ে গেল অন্দরে।

কার সঙ্গে নন্দিনীর বিয়ে? কি করে সে ভদ্রলোক? দেখতে কেমন? পরম্পরায় খবরটা শীলাবতীর কানে এলো। কলেজে ছেলেটি ছিল নন্দিনীর সহপাঠী। দু'জনেই এম-এর ছাত্র। প্রণয়টা পরস্পরের মধ্যে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধ'রে সেই প্রণয় নির্ঝরিণী থেকে নদীতে পরিণত হয়েছে, এখন দুই কূল প্লাবিত। এবার শাঁখ বাজলো।

পাত্রের নাম সুনীল সেন। অমনি শীলাবতী ঘুরে দাঁড়ালো। মাথায় পড়লো বজ্রাঘাত। সুনীল সেন? মানে, সেই সুনীল? শীলাবতীর বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় যেন ধক্ ধক্ ক'রে উঠলো।

*
* *

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় প্রথম হেমন্তকাল। বাতাসটি মধুর, কিন্তু অল্প অল্প গায়ে কাঁটা দেয়। দেরাদুন থেকে নেমে আসার সময় হরিদ্বারের এক ধর্মশালায়।

মা বাবা সঙ্গে ছিলেন।

কেউ বলে আগে থেকে ষড়যন্ত্র, কেউ বলে, না, অমনি হঠাৎ দেখা। যে-পথটা গেছে নতুন কন্‌খলের দিকে, সেই পথে গঙ্গার পাকা বাঁধের কাছে দু'জনে এসে দাঁড়ালো।

লীলাবতী বললে, কেন এলে তুমি?

সুশীল বললে, এলুম তীর্থে। তুমি যেখানে সেখানেই তীর্থ।

তুমি জানো না যে, এ কিছুতেই সম্ভব নয়? মা বাবা রাজি নন্?

তোমার মত আছে?

আমি তাঁদের অবাধ্য নই।

ফিরে গেল সে। ফিরে আর চাইল না। অদ্ভুত উল্লাস হোতো তাকে কাছে পেয়ে। রক্তের ভিতরে একটা দুরন্ত কোলাহল মুখর হ'য়ে উঠতো। পুরুষ জানে কতটুকু? প্রিয়জনের পদচিহ্ন ধ'রে নারীর বুকের তৃষ্ণা ব্যাকুল হয়ে পিছু পিছু ছুটে যায়, পুরুষ কতটুকু জানে—নারীর সে কত আপন?

আবার দেখা বিল্বকেশ্বর মন্দিরে। মন্দির-প্রাঙ্গণ জনহীন, পাশের পাহাড়ের সানুদেশে অরণ্য। এখানে ওখানে তপস্বীর আশ্রম। মধ্যাহ্নে নিস্তব্ধ, যাত্রীর সমাগম নেই।

সে বললে, যাবার আগে জানতে পারলুম যা কোনোদিন জানা সম্ভব হোতো না। যা পাবার নয় তার জন্যই কেবল মাথা কুটতে আসিনি। সাধ ছিল তোমার প্রসন্ন শুভকামনা নিয়ে যেতে পারবো। কেবল কি হাতই পাতবো, দিতে পারবো না কিছু?

এই নাও, এই রইল তোমার পায়ের কাছে আমার বাঁশি, এই পীতবাস, এই আমার মোহনচূড়া। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে এই সাধ রইলো, তুমি যেন সহজে আমার কাছে আসতে পারো, যেন বাধা না থাকে দুই দিক থেকে। কাঁদো কেন?

লীলাবতী বললে, ভাবছি জন্মান্তর।

আমার আশা আরো বড়, আমি ভাবছি এই জীবনেই নয় কেন? বেশ, আমি চললুম। যত দূরেই যাই যেন তোমারই কাছে পৌঁছতে পারি।

লীলাবতী হাত ধ'রে বললে, কোথায় যাচ্ছ?

কোথায়? যাচ্ছি দেশে, কলকাতায়। সেখান থেকে যাবো বম্বে, বম্বে থেকে যাবো বিলেত, বিলেত থেকে পৃথিবী!

*

* *

পায়ের শব্দে লীলাবতীর চমক ভাঙলো। এ কি, সে নিশ্চল হয়ে ব'সে রয়েছে তার পায়াভাঙা তক্তাপোষের উপর! স্বামী ফিরেছেন অফিস থেকে। স্বামী বললেন, কই, নিমন্ত্রণে যাওনি?

মুখের দিকে চেয়ে লীলাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, থাকগে, ভালো কাপড়-চোপড় নেই, ছেলেটারও অসুখ,—যাবার মন নেই।

শ্রান্ত হয়ে সে তক্তার উপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো।

অপর্ণা

শীতের তীব্র বাতাস কাশী শহরের প্রাচীন জীর্ণ কঙ্কালকে কাঁপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। মেঘের জটায় জটায় আকাশ মলিন, পাণ্ডুর, গঙ্গার দূর দূরান্তর ঘন কুয়াসায় রহস্যময়, যেন ভৈরবের তন্দ্রাজড়ানো আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু। উদয়াস্ত সূর্যের দেখা নাই; মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বৃষ্টিবিন্দু চাবুকের মতো গায়ে আসিয়া আঘাত করে।

পথে লোক চলাচল সামান্য। শহরের চাঞ্চল্য কোথাও নাই, পূজাবকাশের যাত্রী-জনতার সহিত তাহার জীবন-স্পন্দনও চলিয়া গেছে; দোকানদানি, পণ্য-বিপণির সমারোহ কোথাও আর দেখা যায়না; উৎসবশেষে আসর ভাঙ্গিয়া একে একে সকলেই অদৃশ্য হইয়াছে। অস্থায়ী চাকচিক্যের মুখোস খুলিয়া আবার দেখা দিয়াছে সেই সুদূর অতীতকালের ভগ্ন অবশেষ। এখন দেখিলে বুঝা যায় এই পৌরাণিক তীর্থস্থানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহস্যের ভাষা; গঙ্গার তীরে মন্দিরে মন্দিরে যেন কবেকার পুরাতন যুগের জটিল ইতিহাস তপস্বীর মতো স্তব্ধ হইয়া আছে। অতি পরিচিত পৃথিবী হইতে দূরে একখণ্ড তপোবনের মতো প্রশান্ত ও নির্লিপ্ত এই শহরটি; যেন যোগাসনে বসিয়া মহাদেব, ধ্যানবিলীন তাঁর চক্ষু।

স্থায়ী বাসিন্দা যাহারা, সকাল বেলায় পূজা ও স্নান তাহারা বন্ধ করেনা। কোনো কোনো স্ত্রী-পুরুষ এ-গলি হইতে ও-গলিতে ঢুকিবার সময় শীতার্ত কণ্ঠে শিবের স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া যাইতেছিল। কেহ কেহ কাঁপিতে কাঁপিতে নিত্যকর্ম হিসাবে ছোট ছোট অসংখ্য

শিবলিঙ্গের মাথায় জলের ছিটা দিয়া পলাইতেছে। বৃষ্টির জলে ও কাদায় পাথর-বাঁধানো পথও অগম্য, এত ঠাণ্ডায় তাহার উপর দিয়া পা ফেলিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য।

দিনের বেলাতেও সরু পথগুলি অন্ধকার। সেখানে মানুষের সাড়াশব্দ সামান্য। এমনি সময়ে সেদিন একটি ঘটনা ঘটিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটের উত্তর দিকে যে সংকীর্ণ ঢালুপথটা উঠিয়া কেদার মন্দিরের দিকে গিয়াছে, সেই পথের প্রান্তে নির্জনে হঠাৎ নারীর কণ্ঠ শোনা গেল।

'কবে এলেন?'

একটি লোক শীতের বাতাস বাঁচাইয়া মুখে মাথায় ঢাকা দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, স্ত্রীলোকের আওয়াজ পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'কে?'

'চিনতে পারলেন না? আমি যে সেই অপর্ণা—যা, ভুলেই গেছেন আমাকে'—বলিয়া মেয়েটি পথে দাঁড়াইয়া হাসিল।

হাসি দেখিয়াই বোধহয় তাহাকে মনে পড়িয়া গেল। লোকটি কহিল, 'ও, আপনি ত হরিহরের বড় বোন? এখানে কতদিন এসেছেন?'

'এখানেই এখন থাকি, ভাঙা বাড়ীর মতন প'ড়ে আছি।'

লোকটি কহিল, আমি আছি মাস দুই। তারপর, হরিহর এখন কোথায়? খবর সব ভালো?'

অপর্ণা হাসিল। হাসিটা ভালো লাগিল না। মুখখানা তাহার শুষ্ক, দুইটা গাল শীর্ণ হইয়া ভিতরে বসিয়া গিয়াছে, দাঁতের দুইটি

পাটি হাসিলে বাহির হইয়া আসে, তাহার উপর শীতের রুক্ষত সেই মুখ ফাটিয়া ছাল উঠিয়াছে। অপর্ণার রূপ নাই।

উত্তর না পাইয়া লোকটি পুনরায় কহিল, 'উঃ এখানে ভা হাওয়া, গলির ভিতরে আসুন,—এই যে, এইখানে; হ্যাঁ, হরিহ ভালো আছে ত এখন?'

অপর্ণা কহিল, 'না।'

'তার মাথার দোষ কি এখনো আছে?'

অপর্ণা পথের এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। তাহার বিবর্ণ স্নেহলেশহীন মাথার চুলে জট পড়িয়াছে, চোখ দুইটায় যেন জাগ্রত চেতনার কোনো লক্ষণ নাই। কিন্তু তাহার কাপড়চোপড়ের দিকে চাহিতে লজ্জা করে। গায়ে একটা ছোট জীর্ণ দোসা, পরণে শতছিন্ন একখানা ময়লা কাপড়,—তাহার পাড় উঠিয়া গিয়াছে। পথের মাঝখানে দাড়াইয়া তাহার সহিত কথা বলিতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ইহাকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর চাওয়াও সময়ের অপব্যয়, বরং এড়াইয়া কোনমতে পলাইতে পারিলেই সম্ভ্রম রক্ষা হয়। রূপ অনেক মেয়েরই থাকেনা; কিন্তু ইহার দারিদ্র্য দৈন্যের দিকে চোখ পড়িলে অপমানে মাথা কাটা যায়। আশ্চর্য, স্ত্রীলোক হইয়া লজ্জা নিবারণ করিবার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! স্বভাব-চরিত্র ভালো বলিয়াই জানা ছিল; তবে কি এখন অন্য রূপ ঘটিয়াছে? কাশী শহরের গোপন ইতিহাস অদ্ভুত। জোর করিয়া কিছুই বলা যায়না।

'আচ্ছা, আমি তবে এখন যাই, আবার কোনো সময়ে—'

'দাঁড়ান—' অপর্ণা বাধা দিয়া কহিল, 'আপনার কাছে বিশেষ দরকার। আসুন আমার সঙ্গে, চারুবাবু।'

চারুবাবু ভীত হইয়া কহিল, 'কিন্তু এখন আমার বড় জরুরি কাজ, আর এক দিন বরং—'

অপর্ণা কহিল, 'তবে চলুন যাই আপনার সঙ্গে। আপনি কাজ সারবেন আমি ততক্ষণ—'

চারুবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। ইহাকে লইয়া কোথাও যাওয়া চলিতে পারে না; গেলে নিন্দা হইবে, লোক সন্দেহ করিবে; কাশীর গলিতে গলিতে নানারূপ অন্যায় ঘটিয়া থাকে; ইহার হাত হইতে মুক্তি না পাইলে অনর্থ ঘটিবে।

'তবে চলুন, আপনার কথাই আগে শুনি।'

'আসুন।' বলিয়া হরিশ্চন্দ্র ঘাটের পথ দিয়া অপর্ণা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইল। চারুবাবু তাহার পাশে পাশে চলিল।

চলিতে চলিতে অপর্ণা কহিল, 'শৈলদিদি আর পিসিমারা ভালো আছেন ত? কুকুরের ছোঁয়াচ কেটে গেছে?'

চারুবাবু কহিল, 'আমি আর কিছু খবর পাইনি।'

'আপনার ওপরেও ওদের রাগ। তা ত হবেই। বাস্তবিক সেবার বেঁচে গিয়েছিল হরিহর আপনারই জন্য, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, খাবার পাঠানো, কাপড় জামা···আমি চিরদিন আপনার কাছে ঋণী।'

চারুবাবু কহিল, 'আপনার এমন অবস্থা হলো কেন?'

'কী অবস্থা?'—বলিয়া অপর্ণা মুখের দিকে তাকাইল।

চারুবাবু একটু লজ্জিত হইল। চোখে আঙুল দিয়া দেখাই্‌
না দিলে যাহার বুঝিবার ক্ষমতা হয় না, তাহাকে আর কী বল
চলে? যেন কোনো দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, নিজের কদ
বেশভূষাকে যে গ্রাহ্য করে না, তাহাকে কী বলিয়া বুঝানো
যাইবে?

চারুবাবু কহিল 'বলছিলাম যে, আপনার কি শরীর অসুস্থ?'

'শরীর অসুস্থ! আমার শরীর অসুস্থ? কে বললে? জীবনে আমার কোনদিন মাথা ধরেনি···আমি কঠিন, নীরোগ, আমি পাথরের কুচি চিবিয়ে—' বলিতে বলিতে সেই কঙ্কালিকা এই প্রচণ্ড শীতের হাওয়ায় ধোসার ভিতর হইতে দুইখানি হাত বাহির করিয়া পুনরায় কহিল, 'আমি এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে শুষে নিতে পারি, জানেন?'

কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে তাহারা চলিয়াছে। সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ, অন্ধকার পথ—এই দিকে চারুবাবু কোনদিন আসে নাই। তাহার কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। মেয়েটি যুবতী, বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী হইবে না, দেহে যৌবনের ঐশ্বর্য নাই, বয়সটা কেবল ঠাহর করা যায় এই মাত্র। একজন যুবককে লইয়া সে চলিয়াছে; এই অনাত্মীয় পুরুষটি তাহাকে একাকী পাইয়া যে বিপদে ফেলিতে পারে,—এসকল কথা তাহার মনেই পড়িতেছে না। অথচ তাহার নিগূঢ় আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেই হইবে, ফিরিয়া পলাইবার সাধ্য চারুর নাই।

আউধগরবী পার হইয়া শিবালায় একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকিয়া

অপর্ণা কহিল, 'আসুন, এইখানে আমি থাকি। সাবধান, মাথা নীচু করে—ভারি অন্ধকার, না?'

দরজা ঠেলিয়া সে ভিতরে ঢুকিল। কোথাও কিছু দেখা যায় না, মানুষের সাড়াশব্দ নাই,—প্রেতপুরীর মতো নির্জন। চারু তাহাকে অনুসরণ করিয়া একখানা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আলো নাই, হাওয়া নাই, ভিতরে পুরাতন পাথরের গন্ধ, মাথার উপরে অন্ধকারে কড়িকাঠ দেখা যায় না,—অসহ্য ঠাণ্ডায় হাত-পা অবশ হইয়া আসে। ঘরে আসবাবপত্র কিছু নাই, কেবল এককোণে দুই একটা পিতলের বাসন চিক চিক করিতেছে। সেগুলি যেন এই বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের ভিতর হইতে কোনো ভয়ঙ্কর প্রেতিনীর কটাক্ষের মতো মনে হইতেছিল। অপর্ণা কহিল, 'বসুন, এই যে কম্বলপাতা এখানে—ও, কিছু দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি? হাঁ, বসুন, ওইখানে, এবাড়ীতে কেউ থাকে না, বেরিবেরি হয়েছিল তাই জন প্রায় সাত আটজন লোক উপরতলায় মারা গেছে। ওপরে যেতে ভয় করে!'—বলিয়া সে হাসিল। মিথ্যা কথা, ভয় তাহার নাই, তাহার হাসি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

চারু কহিল, 'আপনি এখানে একলা থাকেন?'

অপর্ণা কহিল, 'এবাড়ীর লোকেরা পালিয়ে যাবার সময় আমাকে রেখে গেছে, আমি পাহারা দিই। কি দেখছেন ওদিকে, ওটা কলের জলের শব্দ—হাঁ, আওয়াজ শুনতে একটু অদ্ভুত।'

চারু কহিল, 'কাজকর্ম কিছু করেন নাকি?'

'কাজ, না কিছু করিনে। বাংলা দেশের মুখ ভেঙে দিয়েছি

লাথি মেরে···আমার বুকের রক্ত নিয়ে তারা হোলি খেলছে,—না, কিছু করিনে! শুয়ে থাকি এই পাথরে কান পেতে—প্রাণ পেতে ···আসবে, আসবে একদিন, আসবে ফিরে।'

কে আসিবে? ছোট ভাইয়ের মতো ইহারও কি মাথার দোষ আছে? সমস্ত কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া ইহার আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হয় কেন? চারু কহিল, 'এবার আমি যাই।' তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। চারিদিক হইতে কে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

'ওমা, যাবেন কি? আপনাকে যে মনসার প্রসাদ দেবো ব'লে এনেছি।' এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া অন্ধকারে কোথায় যেন হাত বাড়াইল।

'হরিহরের খবর জানতে চাইছিলেন, এই দেখুন—' বলিয়া অপর্ণা একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি বাহির করিল। তাহাতে মাকড়সার জাল, আরসোলা ও ঘুরঘুরে পোকার বাসা—ভিতরে কেমন একটা নোনাধরা সাঁতসেঁতে গন্ধ। পুনরায় কহিল, 'এই তার শেষ চিহ্ন!'

হাঁড়ির ভিতর হইতে তাহাকে একটা মড়ার খুলি বাহির করিতে দেখিয়া চারু শিহরিয়া উঠিল। দরজার ফাঁক দিয়া কোথা হইতে ঈষৎ মেঘের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইল এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর গর্ভের ভিতর কোন্ পাতালপুরীতে তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়া এই প্রেতিনী তাহাকে পরিহাস করিতেছে!

অপর্ণা হাসিতে হাসিতে কহিল, 'এই তার শেষ চিহ্ন! আমার

প্রিয় ভাই, আমার আদর্শ ভাই, আমার—' বলিতে বলিতে উগ্র আনন্দে পাগলিনী সেই মাথার খুলির উপর দুইবার চুম্বন করিল।

চারু কহিল, 'কেমন ক'রে মারা গেল? মাথার দোষটা ছিল শেষ পর্যন্ত?'

হাসিমুখে অপর্ণা কহিল, 'মার খেয়ে মাথার দোষ হয়েছিল! জানি, জানি আমি সব। চারুবাবু, সে যে কি অত্যাচার, কি যে যন্ত্রণা—তবু ত অন্যায়ের রথ চলে গেল নিরপরাধের বুকের উপর দিয়ে—আঃ তবু আমার দুর্দান্ত ভাই পালিয়ে এলো আমার কাছে। কয়েকদিন বাদে দেখি, তার প্রলাপের লক্ষণ; সেটা আর সারলো না। আমার ওপর এখনো ওদের নজর আছে!'

চারু দরজার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, 'এবার আমাকে ছেড়ে দিন।'

বাঁ হাতে মাথার খুলিটা ধরিয়া ডান হাতে অপর্ণা মনসার প্রসাদ বাহির করিল; সামান্য দুইখানি প্যাড়া থালায় করিয়া দিয়া সে উঠিয়া গেল জল আনিতে। ঘটিতে জল আনিয়া আবার বসিল।

'এ বাড়ীতে নয়, ওই দোবাতলার একখানা ঘরে থাকতুম তিনজনে—'

চারু কহিল, 'তিনজনে, মানে?'

'হরিহরের গুরু ছিলেন; আমারো গুরু, আমারো দেবতা। হ্যাঁ, তারপর গোয়েন্দা পুলিশের দল এসে রাতের বেলা এই পাড়াটা ঘেরাও করলে। চেৎসিংয়ের ঘাটের সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলুম। ঘাটে ছিল নৌকো বাঁধা। তিনি ঝাঁপ দিলেন জলে,

সাঁতরে কোন্ অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। এমনি মেঘলা রাত, বৃষ্টি পড়ছে! আঃ, মনে কি ছিল, ভাই আমার সাঁতার জানতো না? দিলুম হরিহরকে নদীতে ফেলে, ওমা, কোথায় গেল? কোথায় গেল পাগল? শেষ রাতে হরিহরের দেহ পেলুম খুঁজে—চড়ায় এসে লেগেছিল!' বলিতে বলিতে অপর্ণা হাসিয়া মাথার খুলিটাকে বুকের মধ্যে লইল। আদর করিয়া পুনরায় কহিল, 'এটা নষ্ট হতে দিইনি, হাতে করে শরীরটা পুড়িয়েছি, বলুন ত, ভালো করিনি? প্রাণ নিয়েছি তার, কিন্তু অপমান হতে দিইনি! কী আনন্দ?' হত্যাকারিণী উন্মাদিনীর মতো হাসিতে লাগিল।

চারু কহিল, 'কাশীতেই বুঝি থাকবেন এখন?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকব, কোথাও গিয়ে ত স্বস্তি নেই! ওই শ্মশানঘাটের দিকে চোখ রাখি—কি জানি, বোধহয় নেশা, বোধহয় সব মিথ্যে! একদিন চুরমার হয়ে যাবে আমার ভুল!'

কিসের নেশা! কিসের ভুল! কিন্তু চারু কোনো প্রশ্ন করিল না, কোনো কথার অর্থ খুঁজিল না। মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

হাঁড়ির ভিতরে সেই অস্থিমুণ্ড রাখিয়া অপর্ণা পুনরায় কহিল, 'ঠিক বাঁচবো চারুবাবু, শেষদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করবো—আসবে, আসবে,—মন বলছে, আসবে! তাই ত ঘুরি পথে পথে, তাই মাথা খুঁড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

চারু কহিল, 'কার কথা বলচেন আপনি? কে আসবে?'

অপর্ণা তাহার কথা কানে লইল না; বাহিরের কোন এক

ফাঁক দিয়া ঘরের ফাটলে যে মেঘের আলোটুকু আসিয়া পড়িয়াছে সেই দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকাইয়া কহিল, 'কুচবিহারের ছত্রে খাই, কালীবাড়ীর দালানে পড়ে থাকি।—এ কি কেবল নেশা, মিথ্যে—?'

তাহার দুরবস্থা দেখিয়া চারুর দয়া হইতেছিল। বড়ঘরের মেয়ে, মাথার দোষ ঘটিয়া এমন হইয়াছে, দেশে দেশে পালাইয়া বেড়ায়,—কিন্তু সে যুবতী স্ত্রীলোক, তাহার সম্ভ্রম আছে, তাহার দায়িত্ব আছে। নানারকমে বাধা ও সঙ্কোচ কাটাইয়া চারু এক সময় কহিল, 'যদি কিছু না মনে করেন তবে একটা কথা বলি।'

অপর্ণা কহিল, 'আগে প্রসাদটুকু খেয়ে নিন, তারপর—'

একখানা প্যাঁড়া হাতে তুলিয়া চারু বলিল, 'আমার যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আপনার কাপড়-চোপড়ের এই অবস্থা, আপাতত পাঁচটা টাকা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি—'

'কি বললেন?'

'মানে পাঁচটা টাকা নিয়ে যদি কাপড় কেনেন—'

'কী বলতে চাও তুমি?'—অপর্ণা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'টাকা? দয়া? কে তুমি?'

হঠাৎ লাথি দিয়া সে মনসার প্রসাদ ও জলের ঘটি দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর জ্বালাময় কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া বলিল, 'খুন করতে চাও, পথের কুকুর এসেছ ঘরে? দূর—দূর—দূর হয়ে যাও তুমি—'

চারু ততক্ষণে উঠিয়া দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; অপর্ণা পুনরায় হাঁড়ির ভিতর হইতে সেই মাথার খুলি বাহির করিয়া

চেঁচাইয়া উঠিল—লজ্জা নাই, শ্রী নাই, সম্ভ্রম নাই—কহিল, 'জানো আমি কা'র বড়বোন, জানো কী জন্যে সব ছেড়ে এসেছি ? . যাও, যাও, দূরে যাও—'

দরজা খুলিয়া পথে পড়িয়া চারু যখন একদিকে চলিয়া গেল, তখন অপর্ণা সেই মাথার খুলিটা বুকে লইয়া চুম্বন করিতে করিতে আর্তকণ্ঠে হাসিয়া কহিল, 'দয়া করতে এসেছিল তোমার দিদিকে, —শুনেছিস ভাই, আমার ওপর দয়া !'

বায়ুলেশহীন সেই অন্ধপুরীর ভিতরে অসম্বৃতবস্ত্রা প্রেতিনীর খলখল হাসি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রাচীন বটগাছের ঝুরি নামিয়াছে গঙ্গার স্রোতের উপর। মাথার উপরে বিশাল মন্দির। সেই মন্দিরের নীচের তলায় বর্ষার দিনে নদীর জল ঢুকিয়াছিল, সেই জল ও মৃত্তিকা এখনো সেই অন্ধকার পাতাল-পুরীর পাঁজরের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া পাথরের স্তূপকে ক্ষয় করিতেছে। ওপারে বালুময় প্রান্তরের শেষসীমায় দিগন্তে বাবলা বনের শীর্ষ দেখা যাইতেছিল, দক্ষিণে রামনগর রাজপুরীর ছায়া।

নদীর তীরে মৃত্তিকাময় পথ, তাহারই উপর কোথাও বিভূতি-ভূষণ সন্ন্যাসীর আস্তানা, কোথাও পূজারীর আসর, কোথাও স্নানরত স্ত্রী-পুরুষ। আবার কোথাও কিছু নাই, দুইখানা খেয়া-নৌকা কেবল রৌদ্রে জলে একই অবস্থায় পড়িয়া আছে। নিকটে কিংবা দূরে বোঝা যায়না—কিন্তু কোথা হইতে অবিরাম আরতির শাঁখ ঘণ্টা শোনা যায়, তাহার সময় নাই, সামঞ্জস্য নাই। পশ্চিমতীরে

মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাট,—চিতার আগুন হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে, নদীর প্রবাহে সে আগুন নিভে না। দিনের পর দিন,—চিরদিন!

কে আসে, কে যায়, কোথা দিয়া কোথা চলে, কাহারা যায় দলে দলে,—অথচ নির্জন সংকীর্ণ জটিল পথ একদিকে বাহির হইয়া আর এক দিকে হারাইয়া যায়। মানুষ কোথাও নাই অথচ কণ্ঠস্বর, মন্দিরের চিহ্ন নাই অথচ কাঁসর ঘণ্টা,—যেন ইহার সিঁড়িতে সিঁড়িতে, পথে পথে, প্রস্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাষা আছে; কি যেন কথা কয়, কে যেন ডাকে, কোথা দিয়া কাহার পদশব্দ যেন মিলাইয়া যায়। সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে যেন ভয়ের বাসা, নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যেন চিরপুরাতনের আদি কাহিনী, জনহীন পরিত্যক্ত পাথরের কুটুরীতে যেন আবহমানকালের এক জরাজীর্ণ আত্মা লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিতে থাকে। যুগযুগান্তের জন্ম-মৃত্যু জরার উপর কালভৈরবের রুদ্র তাড়নায় প্রেতাত্মার দল শূন্যপথে কাঁদিয়া বেড়ায়! নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে ডাকিনী যোগিনীর দল নরমুণ্ড লইয়া শ্মশানে শ্মশানে নাচিয়া বেড়ায়।

কেহ কাহারো নয়, সন্ন্যাসীর ধুনির সহিত চিতাগ্নির সম্পর্ক নাই, অন্ধ সুড়ঙ্গের সহিত নাই নদীর গভীর আত্মীয়তা, প্রেতপুরীর সহিত নাই প্রাচীন অশ্বত্থের সংযোগ—অথচ সমস্তই এক, অবিচ্ছিন্ন, ইহার সহিত উহার কঠিন যোগসূত্র, আত্মায় আত্মায় পরস্পরের রহস্যময় আলাপ চলিতে থাকে।

দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। বোধ করি একাদশ তিথি, দোকানগুলি বন্ধ। শাকসব্জী বিক্রেতারা বিকিকিনি সারিয়া পসরা

লইয়া চলিয়া গেছে। আজ আকাশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘ নাই, রৌদ্র ঝলমল করিতেছিল।

মধ্যাহ্ন অলস, উদাসীন। যাহারা স্নান করিবার তাহারা একে একে ঘাট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেছে, যাহাদের ঘর আছে তাহারা গিয়াছে ঘরে। একাদশী তিথি, কোথায় যেন তুলসীদাসের রামায়ণ লইয়া কথা চলিতেছে। একজন দোহার ব্যাখ্যা করিতেছিল। আজ কোথায় যেন ভাগবত পাঠ হইবে, আগে ভাগে গিয়া স্থান দখল করিবার জন্য দু'একজন বৃদ্ধা গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়া এইমাত্র পথ দিয়া পার হইয়া গেল।

পথ নির্জন, এমন নির্জন যে, কান পাতিলে কৃশাঙ্গিনী গঙ্গার কল-কল্লোল শোনা যায়; তাহার পর পারে বালুময় প্রান্তর সূর্যের কিরণে ঝিকিমিকি করিতেছে। কোথাও কোথাও চরে নৌকা বাঁধিয়া যাত্রীর দল-তাঁবু খাটাইয়া রান্নার আয়োজন করিতে ব্যস্ত। নদীর প্রবাহ মন্থর, শান্ত, কেদারঘাটের উপরে বিশাল পাষাণপুরী, নীচে অথৈ গঙ্গা; যেন যোগীর জটা দিয়া জাহ্নবীর ধারা নামিয়া আসিয়াছে। ঘাটে দু'একজন লোক ছত্রীর তলায় বসিয়া বিশ্রাম লইতেছিল। আর কোথাও মানুষ নাই!

এই রৌদ্র ঝিলিমিলি উদাস মধ্যাহ্নে কোন্ জীবনবৈরাগীর বুকের রক্তকে না চঞ্চল করে? কেহ চঞ্চল হয়, কেহ হয় না। অপর্ণা চঞ্চল হইয়াছিল। কুচবিহারের ছত্রে যাইবার পূর্বে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া তাহাকে যাইতেই হয়। পূজা তাহা নাই, মন্ত্র সে পড়ে না, দেবতাকে সে বিশ্বাস করে না। যা কিছু ভালো,

যা কিছু নীতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রতি অপর্ণার নিদারুণ আক্রোশ। কিন্তু সে গঙ্গায় আসে, গঙ্গায় বসে, গঙ্গায় ডুব দিয়া চলিয়া যায়।

রৌদ্র তখন প্রখর, পথ জনহীন,—অপর্ণা তখন ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। কে জানিত বজ্রাঘাত হইবে।

কেদারমন্দিরের দেয়ালের গায়ে একটা সংকীর্ণ পথ এদিকের রাস্তা হইতে ওদিকে ঘাটের সিঁড়িতে গিয়া ঠেকিয়াছে, চারিদিকে ইমারতে ঠাসা সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার,—দুইদিকে দুটি দরজা ছাড়া আলো বাতাসের আর পথ নাই। সেই সংকীর্ণ যাতায়াতের পথে মানুষ চেনা কঠিন।

কিন্তু প্রাণমন্দিরের নিভৃত মণি-কোঠায় যে দেবতা নিত্য জাগ্রত, তাঁহাকে কি চিনিতে ভুল হয়? অপর্ণা ছুটিতে ছুটিতে পথের উপর হইতে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাকে ঘাটে যাইতে হইবে; বিপরীত দিক হইতে স্নান সারিয়া আসিতেছিল একটি লোক, সৌম্য, সুন্দর, বলিষ্ঠ। মুখোমুখি হইতেই পলকের জন্য তাহার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া ওই ঈষৎ অন্ধকারে অপর্ণা অস্ত্রবিদ্ধা উন্মাদিনী ব্যাঘ্রার মত আর্তনাদ করিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই বজ্র-সর্পের ন্যায় নিজের দুই শীর্ণ দীর্ঘ হাতের পাকে পাকে লোকটিকে কঠিন-কঠোর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল, তারপর তাহার বুকের ভিতরে মাথা লুকাইয়া বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, তুমি—তুমি এলে এতদিনে! ওগো, তুমি যে বেঁচে আছ আমি জানতুম না,—তুমি—তুমি—'

দেবতা অটল, অচপল! তাহার বিকার নাই, চিত্ত-চাঞ্চল্য নাই!

কিন্তু একি, কেন দেয় না সাড়া শব্দ? কেন প্রকাশ পায় না উত্তেজনা? তবে অপর্ণা অন্ধকারে কাহাকে ধরিয়াছে? মুহূর্তে সন্দেহ করিয়া তাহার আলিঙ্গন শিথিল হইয়া গেল, শিহরিয়া উঠিয়া আর্তনাদ করিল, 'তুমি কে—কে তুমি?'

লোকটি বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কে আপনি, কাকে চান?'

অপরিচিত লোকটা বিমূঢ় হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। সন্দেহ রহিল না, অপর্ণা ভুল করিয়াছে। একটি নিমেষ মাত্র, তার-পরই মুখের কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ করিতে করিতে অপর্ণা ছুটিয়া সেই সুড়ঙ্গের পথ দিয়া গঙ্গার দিকে পলাইয়া গেল!

ঘাটের সিঁড়ি দিয়া পাগলিনী মন্দিরে ঢুকিয়া কি করিবে বুঝিতে পারিল না, কেবল দাঁতের উপর দাঁত ঘষিতে লাগিল, কুশাঙ্গিনী, অভিশপ্তা—জগতে তাহার কেহ নাই! কিন্তু আর সে সান্ত্বনা মানিল না, হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া তীর্থ-দেবতার প্রস্তর-মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কাঁদিয়া কহিল, 'ভুল, ভুল, কেবল ভুল ক'রে চলেছি! বলো তুমি, বলো তুমি বেঁচে আছ, না, বেঁচে নাই! বলো তুমি, জীবনে কি আর দেখা পাবো না?'—কপাল কাটিয়া দর দর করিয়া তাহার রক্ত ঝরিতে লাগিল!

শ্বশুর বাড়ী

পুরাতন রায়দের বংশে বাতি দিবার কেহ নাই, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে। বাতি দিবার মানুষ হয়ত আছে কিন্তু তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। আগে ছিল প্রকাণ্ড যৌথ পরিবার, রাবণের বংশ, বড় বড় তালুক, হাতীশালায় হাতী, হীরা-জহরৎ, দোল-দুর্গোৎসব—কিন্তু এখন তার চিহ্ন কোথায়? কোন মহাকাল দূরে দাঁড়াইয়া ফুৎকার দিয়া সব উড়াইয়া দিল? সেই জমীদারি আর নাই, খাসমহল আসিল কলিকাতায়, সেই বিরাট বংশাবলী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোথায় কোন্ অলি-গলিতে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে কে জানে। তবু হয়ত বাতি দিবার মানুষ কেহ আছে!

অনেক নদী নানা শাখায় বহিয়া যায় নানা দিকে। শুনা যায়, রায়দের বংশের কোনো কোনো শাখায় আধুনিক সভ্যতার জোয়ার আসিয়া তাহাদের সমুদ্র পারের দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহারা নূতন জাত, তাহাদের বংশ-পরিচয় দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। একদল আছে গ্রামে, অতীত ভগ্ন অবশেষ লইয়াই তাহাদের গৌরব,—চাষবাস করিয়া চলে, কাহারও হাতে বা মহাজনী কারবার। দুই দল আসিয়াছে কলিকাতায়। প্রথম দল ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল, সেই ঐশ্বর্যের কঙ্কাল আজিও কোথাও কোথাও বর্তমান; অন্য দল কাজ-কারবার লইয়া থাকে। কেহ চাকুরে, কেহ দোকানদার,

কেহ বা কনট্রাক্টর। হয়ত দরিদ্র হয়ত বা মধ্যবিত্ত। কেহ নিজের অধ্যবসায়ে বড় হইবার চেষ্টা করিতেছে, কাহারও বা অন্ন সংস্থানও হইতেছে না। রায় বংশের পরিচয় দিবার আর কিছু নাই।

ভবশঙ্কর রায়ও কোথাও নিজের পরিচয় দেন্ না, দিবার হেতুও নাই এবং গায়ে পড়িয়া বংশ পরিচয় দেওয়ার মধ্যে সৌজন্যও নাই। ভবশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার সম্পত্তি পিতৃপুরুষের সমুদ্র হইতে ধারকরা জলে সরোবর প্রতিষ্ঠার ন্যায়, কিন্তু তাহাও নিতান্ত সামান্য নয়। পিতা জীবিত নাই, সম্পত্তি আছে। কলিকাতার এক বড় রাস্তার ধারে ভবশঙ্করের বাড়ী ভাড়া খাটে। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।

একদিন তাঁহার স্ত্রী সুলোচনা বলিল, তোমার বাবা খুব উঁচু মেজাজের লোক ছিলেন, যাই বলো তুমি।

ভবশঙ্কর বলিল, কি ক'রে জান্‌লে? তুমি ত তাঁকে দেখোনি?

তাঁকে দেখিনি, কিন্তু তোমার মধ্যে মাঝে মাঝে তার আভাস পাই। মনে ক'রো না তোষামোদ করছি—

ভবশঙ্কর হাসিয়া বলিল, মাত্র আভাস? এর পরের পুরুষে আর বোধ হয় কিছুই পাওয়া যাবে না!

সুলোচনা কহিল, কি ক'রে জান্‌লে?

জান্‌লুম এই কারণে যে, আমি ব্রাহ্মণ আর তুমি ব্রাহ্মণ নয়। অসবর্ণ বিবাহে বংশের চরিত্রটা খাঁটি থাকে না।

তুমি কি বলতে চাও, শূদ্রের রক্তে উঁচু মেজাজ নেই?

ভবশঙ্কর বলিল, হয়ত আছে, আমি জানিনে। শূদ্র আর ব্রাহ্মণের সংমিশ্রণে যে পুরুষের জন্ম হবে তার প্রকৃতি কেমন হবে কে জানে বলো ?

কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। সুলোচনা চুপ করিয়া রহিল।

ভবশঙ্কর পুনরায় বলিল, আমি যে-প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি, সেই ধারার সঙ্গে আমার সন্তানের মিল নাও হ'তে পারে।

সুলোচনা কহিল, যদি ধরো মিল না হয় ?

কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। বংশ মর্যাদা ? ওটা শিক্ষা আর রুচির ওপর দাঁড়ায়। কলকাতার অনেক বনেদী বংশ দুর্নীতির বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে ; অথচ বংশ হিসাবে তারা খুব খাঁটিই ছিল।

তুমি কি বল্‌তে চাও আমি শূদ্রের মেয়ে বলে তোমার বংশের আভিজাত্য নষ্ট হয়েছে ?

ভবশঙ্কর বলিল, সে বিচার আমি করতে পারব না। তবে আমার মনে হয় আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় কৃত্রিমতায়। ব্রাহ্মণের রক্ত আর শূদ্রের রক্তে প্রভেদ আছে, প্রত্যেকটারই বৈশিষ্ট্য আছে। শূদ্রের আভিজাত্য তার অবিমিশ্র রক্তে।

সুলোচনা স্বামীর পাশে আসিয়া বসিল। নানা কথার পর বলিল, তোমাদের এত বড় বংশ, কিন্তু তোমাকে ছাড়া ত আর কাউকে দেখলুম না ?

ভবশঙ্কর বলিল, কাকে দেখতে চাও ?

সুলোচনা কহিল, ধরো এই তোমার বংশে প্রাচীন এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন ?

ওঃ, হ্যাঁ, তাঁদের কেউ কেউ এখনো আছেন বটে। আমার বাবার খুড়ো, তাঁদের ঠাকুরমা—কে এক রাঙাদিদি—

কেমন মানুষ তাঁরা ?

ভবশঙ্কর হাসিল। কহিল, কেমন দেখলেই বুঝতে পারো আগেকার কালের লোক ! আমার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল পথে আসতে আসতে।

কে তিনি ?—সুলোচনা প্রশ্ন করিল।

তিনি বাবার এক জ্ঞাতি মামা। বয়স তাঁর প্রায় আশী। প্রথমটা চিনতে পারিনি, শেষকালে পরিচয় হোলো। আমি অসবর্ণ বিয়ে করেছি জেনে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। বুঝতে পারলুম না কিছু তাঁর মুখের চেহারায়। চোখে কোনোভাষা নেই, মুখে কোনো বিকার নেই। তারপর তিনি নিজেই অন্য প্রসঙ্গ তুললেন ; বললেন, বছরে আমার শ'খানেক টাকা পাওনা হয়, কিন্তু আমি নিইনে কেন ! সামান্য হোক তবু ত পৈতৃক সম্পত্তির আয় বটে !

সুলোচনা বিস্মিত হইয়া কহিল, তারপর ? আর কি বললেন ?

ভবশঙ্কর বলিল, বুড়োর কী দুঃখ ! অনুযোগ জানালো আমি যাইনে কেন, গিয়ে থাকিনে কেন—এইসব। পথে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়িতে ওর বেশী আর কথা হোলো না।

সুলোচনা বলিল, তুমি ত আগে বলোনি যে তোমার সম্পত্তির অংশ আছে ? তোমার আয় আছে ?

থাকলেই বা আদায় করে কে ? একশোটা টাকার জন্য যে-পরিমাণ ঝঞ্চাট আর হায়রানি, তার চেয়ে—

সুলোচনা কহিল, তা হোক, যা প্রাপ্য তা ত্যাগ করা অন্যায়। আমাকে একদিন তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতেই হবে, আমি দেখবো সবাইকে।

ভবশঙ্কর কহিল, সে কি, তুমি যাবে? তাঁরা সব সেকেলে, প্রাচীন, তাঁদের মধ্যে তুমি গিয়ে—

ক্ষতি কি? তারা কি আমার কেউ নয়? আমি যে তাঁদের বংশের বউ! দুদিন গিয়ে থেকে এলে,—না হয় নিজের রান্না আমি নিজেই ক'রে নেবো।

সাহস হবে তোমার?

ওমা, ভয়টা কি! মানুষ ত তাঁরা!

ভবশঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

স্বামী স্ত্রীর এই আলোচনার পর কিছুকাল চলিয়া গিয়াছে। একদিন আবার কথাটি উঠিল। যে বাড়ীতে তাহারা আছে সে-বাড়ী মেরামত হইবে,—দিন দুয়েকের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দিলে ভালো হয়। সুতরাং সুযোগ মিলিয়া গেল। সুলোচনা প্রস্তাব করিল, যদি যাইতে হয় তবে এই সময় যাওয়াই খুব সুবিধা। ভবশঙ্কর রাজি হইল।

সেখানে কি আছে এবং কি নাই তাহা বিবেচনা করিয়া সুলোচনা কিছু বিছানা-পত্র ও সংসারের সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে লইল। এতদিন বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর আত্মীয়-স্বজন বলিতে কাহাকেও সে দেখে নাই। মনে মনে তাহার আনন্দ হইতেছিল। সে ভালো করিয়া আলতা পরিল, মাথার চওড়া করিয়া সিঁদুর

পরিল, গায়ে অলঙ্কার চড়াইল। প্রাচীন কালের লোকে লেখাপড়ায় বিশেষ আদর করে না, পোষাক পরিচ্ছদ খুব বে তাহাদের প্রিয় নয়; সুতরাং কেহ প্রশ্ন করিলে সে স্বীকার করি 'কথা-মালা' ছাড়া সে আর কিছু জানে না এবং এই রাঙ্গাপা শাড়ী আর যেমন তেমন একটা জামা পরিয়াই সে থাকে। তাছাড় মানুষের মন জয় করার একটা সহজ কৌশল তাহার জানা আছে। সুলোচনা মনে মনে নিজের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়া স্বামীর সহিত একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ঠিকানা ভবশঙ্কর জানে। কলিকাতার উত্তরাংশ উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা শহরতলীতে আসিল। শীতের বেলা, ইহারই মধ্যে রৌদ্র হালকা হইয়া আসিতেছে। এপথ দুজনেরই প্রায় অপরিচিত। শহরের কোলাহল ধীরে ধারে মিলাইয়া আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে পাইকপাড়ার ভিতর দিয়া দমদমার পথে এক জায়গায় আসিয়া তাহাদের গাড়ী থামিল। ভবশঙ্কর গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিল।

সুলোচনা এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, কোথায় এলে? নিশ্চয় তুমি পথ ভুল করেছ।

না গো, এই যে বাড়ী, এই যে এইদিকে—

ওমা, ওখানে আবার মানুষ থাকে? পোড়ো বাড়ী!

ভবশঙ্কর বলিল, আমিও এই প্রথম এলুম। কিন্তু এইত নম্বর মিলেছে, রাস্তাও এই। বাড়ীর বর্ণনাও মিলে গেছে হুবহু। এসো, দাঁড়িয়ো না, লোকে কী ভাববে?

সুলোচনা বলিল, দরজা কোন্ দিকে ?

ভবশঙ্কর হাসিয়া বলিল, ওই যে দরজা—

ওটা ত সুড়ঙ্গ ! তুমি ডাকো ওখানে দাঁড়িয়ে কাউকে, দেখো যেন সাপখোপ কামড়ায় না !—বলিয়া সুলোচনা সভয়ে চারিদিক তাকাইতে লাগিল।

সুমুখের দিকটা একতলা, তাহার উপর বড় বড় বট ও অশ্বত্থ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে,তাহাদের পিছনে কি আছে আর কি নাই তাহা বলা কঠিন। ভবশঙ্কর একবার গিয়া চারিদিক ঘুরিল, তারপর অদৃশ্য হইল. কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, চলো, পেয়েছি।

সুলোচনা আর কিছু প্রশ্ন করিল না, ভয়ে ভয়ে কেবল স্বামীর অনুসরণ করিল।

সুড়ঙ্গ বলিয়া যাহা মনে হইয়াছিল তাহাই এবাড়ীর তোরণ দ্বার। মাথা হেঁট করিয়া ভিতরে যাইতেই অন্ধকার যেন তাহাদের গ্রাস করিল। সুলোচনা জুতা পরিয়া আসে নাই, মাটির ঠাণ্ডায় পা কন্ কন্ করিয়া উঠিল। দুই তিনটা পথ পার হইয়া তাহারা অন্দর মহলে আসিল। সম্মুখে উঠান। তাহার পাশে দুর্গাদালান। সেখানে নবাবী আমলে পূজা হইত. এখন সাপ ও বাদুড়ের বাসা হইয়া আছে। ঝড়েও কাৎ হয় না, বৃষ্টিতেও ধ্বসে না। উঠানের পরে আবার প্রেতপুরীর পথ আরম্ভ হইল। আলোর আভাস যেন অন্ধকারের পায়ের তলায় বসিয়া আছে। আলো আঁধারের রহস্য পুরী।

উপরের সিঁড়িতে উঠিতেই এক বৃদ্ধা বিধবার দেখা পাওয়া

গেল। শান্ত, ধীর নির্বিকার এক বৃদ্ধা। সিঁড়ির উপর উঠিয়া সুলোচনা তাহার পায়ের ধূলো লইল, তিনি কেবল বলিলেন, কল্যাণ হোক।

কথার ভিতর প্রাণের কোনো উত্তাপ নাই। যেন কলের পুতুলের মুখ হইতে একটা শব্দ বাহির হইল মাত্র। কিন্তু তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া দুইজনে উপরে উঠিয়া গিয়া উত্তর দিকের একখানা ঘরে ঢুকিল। ঘর দেখাইয়া দিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। ঘরের ভিতরের বাতাসটা যেন রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের মতো। একটি মাত্র দরজা আর একটি জানালা। জানালার ধারে প্রাচীন একটা আম গাছ, তাহার ভিতর দিয়া কেবল জঙ্গলই দেখা যায়। ভিতরে পুরাতন কাঠ আর ইমারতের গন্ধ। কড়িকাঠের কাছে কোথায় পোকার শব্দ হইতেছিল। দেয়ালে কোথাও চুণকাম নাই, কেবল ইমারতের স্নায়ুতে-স্নায়ুতে উইপোকার জটিল জট পাক খাইয়া বসিয়া যেন ভিতরের রক্ত শোষণ করিতেছে। নিজের জিনিসপত্রগুলির উপর চাপিয়া বসিয়া সুলোচনা কহিল, কোথায় এলুম ?

শ্বশুরবাড়ী! বলিয়া ভবশঙ্কর হাসিল।

তাহার হাসির সহিত যেন এই প্রাচীন ভিটার কোথায় একটা সামঞ্জস্য আছে। এটা তাহারই পিতৃপুরুষের আলয়। এখানে সে আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়াছে, ভবশঙ্কর তাহাদেরই একজন; সুলোচনাই কেবল এখানে একা। জনমানবের [illegible] দেখা যায় না, সুলোচনা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

কোন্ দিকে বাহির হইবার পথ, কোন্ দিকে কলিকাতা শহর, কোথায়· মানুষ থাকে,—সুলোচনা কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। এক সময় মুখ তুলিয়া কেবল কহিল, একটা ছেলেপুলেও এ বাড়ীতে নেই?

এমন সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মাথায় ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিতেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিলেন। বলিলেন, এই যে, তারপর? ভালো সব?

ভবশঙ্কর কহিল, আজ্ঞে হাঁ। এই একবার দেখতে এলুম আপনাদের। এমন কিছু বেশীদূর পথ নয়।

বৃদ্ধ কহিলেন, উটি তোমার সেই স্ত্রী, নয়? আর সব কোথায়?

কার কথা বলছেন আপনি?

বৃদ্ধ বলিলেন, তোমার কথা বলছি। ছেলেপুলে নেই?

আজ্ঞে না।

সুলোচনা উঠিয়া গিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিল। তিনি একবার ঘরের ভিতরে তাকাইলেন, কী দেখিলেন বুঝা গেল না, তারপর চলিয়া গেলেন। ইহারা সবাই বৃদ্ধ আর পক্বকেশ, সবাই জরাজীর্ণ। একজন করিয়া আসিয়া দেখা দেয়, কথা না বলিয়াই চলিয়া যায়।

অভ্যর্থনাও নাই, বিরক্তিও নাই। ইহাদের ব্যবহারে যেন গভীর নির্লিপ্ততা। ইহারা কাছে ডাকে না, দূরে সরাইয়া দেয় না,—সুলোচনা বিস্ময়ে হতচকিত হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, এরা কে তোমার?

ভবশঙ্কর কহিল, গুরুজন।

সম্পর্ক কি ?

ঠাকুরদাদার জ্ঞাতি গোষ্ঠি,—আর কিছু জানিনে।

খানিকক্ষণ পরে একটা লোক কতকগুলি বিছানা-পত্র আনিল। লোকটা যেন প্রাচীন যুগের ক্রীতদাস, তাহার নিজের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই, কোন অভিমান নাই, নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে সে বিছানা পাতিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই স্ত্রী' মানে কি গো ?

ভবশঙ্কর কহিল, মানে, আমি যে ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে করিনি, তুমি শূদ্র, তাই জিজ্ঞাসা করছিল।

ও, বলিয়া সুলোচনা চুপ করিয়া গেল।

চারিদিকে মানুষের সাড়া কোথাও নাই। যাহারা এখানে থাকে কোন্ দিক দিয়া গেলে তাহাদের দেখা পাওয়া যাইবে, তাহাও বুঝা যায় না। বাহিরে বেলা এখনো আছে কিন্তু এই অন্দপুরীর ভিতর দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। যে বিছানাগুলি পাতিয়া দিয়া গেল সেগুলি হইতে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বাহির হইয়া ঘরের জমাট বাতাসকে আরো যেন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে—সেই গন্ধে পাওয়া যায় দূর অতীত কালের রায় বংশের বিচিত্র ইতিহাস।

সুলোচনা প্রশ্ন করিল, উনি যে বলছিলেন আর সব কোথায়—তার মানে কি ?

ভবশঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মুখ তুলিয়া কহিল, তার মানে, আমার আর ক'জন স্ত্রী আছে !

ক'জন স্ত্রী!

হ্যাঁ, আমরা যে কুলীন!

এমন সময় এক বৃদ্ধা আসিলেন, ইনি অন্ধ জন। সৌম্য, শান্ত মূর্তি। বয়স আশী হইতে পারে, একশো হইলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। সুলোচনা উঠিয়া গিয়া প্রণাম করিল। কিন্তু তিনি পাষাণ মূর্তি, দেবী মূর্তি। তাঁহার বিকার নাই, ভ্রূকুঞ্চন নাই, মুখে হাসি নাই; একটি আশীর্বাণীও উচ্চারণ করিলেন না। সুলোচনার প্রতি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিলেন, একবার ঘরের ভিতর লক্ষ্য করিলেন,—তারপর আর দাঁড়াইলেন না। যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনিই চলিয়া গেলেন।

সুলোচনা কহিল, উনি কে?

ভবশঙ্কর কহিল, কেমন ক'রে জান্‌ব?

আমাদের বাড়ীর ভেতরে ডাকে না কেন?

ভেতরে কোনোদিন আমাদের ডাক্‌বে না।

কেন?

ভবশঙ্কর কহিল, আমি জাত খুইয়েছি!

সুলোচনা কহিল, কই, সে কথা ত বলে না!

বলতে গেলে ওদের সম্মান হানি হবে!

এখানে না এলেই হোতো!—বলিয়া সুলোচনা নিশ্বাস ফেলিল।

ভবশঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। ভিতরে যাইবার সাহস তাহারও নাই। সে যে এই বংশের সন্তান তাহার একমাত্র প্রমাণ যে, তাহার নামে রাজস্ব জমা দেওয়া হয়। জীবনে এই প্রথম সে

পিতৃপরিচয় লইয়া পিতৃপুরুষদের দেখিতে আসিয়াছে। ইহারা কুলীন বনেদী, পৃথিবীর আলোবায়ু হইতে ইহারা দূরে থাকে। মুসলমান রাজত্ব গিয়া যে ইংরাজ রাজত্ব হইয়াছে, ইহাও বোধ হয় ইহাদের কানে এখনো পৌঁছায় নাই। অদ্ভুত রাজ্যে ইহাদের বাসা।

ঘরের ভিতরে নানারূপ শব্দ হইতেছিল। পোকা-মাকড়, টিক্‌টিকি, ঝিঁঝিঁ, চাম্‌চিকে,—এবং আরো অনেক বিচিত্র আওয়াজ। সুলোচনা বলিল, এই ঘরে রাত্রে আমাদের থাকতে হবে?

ভবশঙ্কর বলিল, তাই ত মনে হ'চ্ছে।

তুমি গিয়ে বলো যে, আমরা আজই যাবো।

যাইতে হইল না, দুইজন মানুষ আসিল। একজনের হাতে একটা তেলের আলো, আর একজনের মাথায় একটা ধামা এবং হাতে এক ঘড়া জল।

লোকটা ধামা নামাইল। তাহাতে ফল-মূল, চিঁড়ে, দই, ছানা, চিনি, পান-সুপারী,—তার পাশে পিতলের একটা ঘটি। সমস্তই রাত্রির আহার। অন্যজনের হাতে একবাটি তেল। তাহারা আত্মীয় নয়, তাহারা যেন অতিথি।

ভবশঙ্কর প্রশ্ন করিল, এই ঘরে আমরা থাক্‌ব?

তেলের বাটিটা প্রদীপের তলায় রাখিয়া একজন কহিল, হ্যাঁ, এইটিই ভালো ঘর।

বলিয়া উঠিয়া দুইজনেই চলিয়া গেল। আলোটি রাখিয়া গিয়াছে এজন্য দুইজনকেই ধন্যবাদ। কিন্তু আহারের আয়োজন

দেখিয়া সুলোচনা রাগে গম গম করিতে লাগিল। বাড়ীতে থাকিলে এতক্ষণ রান্না বান্না করিয়া সে ঘর ভরিয়া তুলিত। তাহার কান্না পাইল। তাহার মরণ হয় নাই কেন? কেন এখানে আসিবার সাধ হইয়াছিল? ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, আমাদের এরা সবাই মিলে যেন অপমান করছে!

ভবশঙ্কর কহিল, না, সম্মানও দেবে না, অপমানও করবে না। এরা নীরবে আমাদের অস্বীকার করবে।

কী অন্যায় করেছি?

তাও ওরা বলবে না।

আমি যাবো ওদের কাছে। আলোটা দাও ত? বলিয়া সুলোচনা উঠিয়া আলো হাতে লইল, তারপর স্বামীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে ঘরের বাহির হইল; অজানা প্রেতপুরীর রহস্যময় পথ অতিক্রম করিয়া আজ মানুষ খুঁজিয়া সে বাহির করিবে।

ভবশঙ্কর বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এ-বাড়ীতে আনন্দ নাই, উৎসব নাই, সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টা বাজে না, প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় না; জন্মজরা মৃত্যু যেন স্তম্ভিত হইয়া ইহার দেয়ালে, প্রাচীরে, ইমারতে, ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাঁধিয়া আছে। যেন কালের উত্থান পতনের সাক্ষী। শিশুর চাপল্য, যৌবনের কোলাহল, জীবনের বহিরঙ্গের কলরব যেন কোনোদিন এই পাথর পুরীকে চঞ্চল করে নাই। কেবল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার দল নিজের মনে বসিয়া অতীত ইতিহাস লিখিয়া চলিয়াছে। তাহার আদি নাই, তাহার অন্ত নাই। ভবশঙ্করের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিল।

পাঁচ সাত মিনিট পরে সুলোচনা ফিরিয়া আসিল। আলোটা রাখিয়া বলিল, কই, কারুকে খুঁজে পেলুম না, কোথায় থাকে বলো ত?

ভবশঙ্কর বলিল, আমি তোমারই মতন অন্ধ!

সুলোচনা কহিল, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে সদর দরজা দেখতে পেলুম, বেরোবার পথটা চিনে এসেছি।

তবে অন্দর মহল কোন্ দিকে?

পারলুম না আবিষ্কার করতে।—হতাশ হইয়া সুলোচনা কহিল।

ভবশঙ্কর বলিল, বোধ হয় ওদের মধ্যে ঢোকা যায় না।

ঘরের বিছানা, আহারের আয়োজন, প্রদীপের চেহারা, ঘনায়মান সন্ধ্যার বুক-চাপা বিভীষিকা সমস্ত উপলব্ধি করিয়া সুলোচনার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্তের জন্য তাহার মন এখানে বসিতেছে না। সে কহিল, চলো চলে যাই।

সে কি, ওরা যদি কিছু মনে করে?

করুক, আর ত আসবো না কোনোদিন?

ভবশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বেরোবার পথ ঠিক মনে আছে? বেশ, চলো। বলিয়া দুইজনে জিনিস-পত্র ভাগাভাগি করিয়া হাতে তুলিয়া লইল। একবার যেন তাহাদের মনে হইল, আবহমান কাল হইতে তাহারা ইহার মধ্যে বন্দী; তাহাদের নিশ্বাসে, তাহাদের শিরায় ও স্নায়ুতে এই জরাজীর্ণ অতীত যেন বাসা বাঁধিয়া আছে।

সুলোচনা আলোটা হাতে লইল, ভবশঙ্কর পিছনে পিছনে

চলিল। পথের পর পথ, রহস্যের পর রহস্য, গ্রন্থির পর গ্রন্থি। কোথাও আর কিছু দেখা যায় না, তাহাদেরও কেহ দেখিল না; দুইজনে চোরের মতো বাহিরে দরজায় আসিল।

শ্বশুর বাড়ীতে সুলোচনার এই প্রথম ও শেষ আগমন। দরজার কাছে আলোটা রাখিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। মনে মনে বলিল, হে প্রাচীন, তোমার কাছে কিছু লইব না, কিছু দিব না। তুমি আছো কি নাই তাহাও ভাবিব না; কিন্তু আমাদের পথ আলাদা, আমরা নূতন পৃথিবীর মানুষ! আমাদের মার্জনা করিয়ো।

সুলোচনার চোখে জল আসিল।

কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না, কেহ খোঁজও লইল না,—স্বামী ও স্ত্রী বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

তাহারা আলো দেখিল, বাতাস পাইল, আকাশ পাইল। দুইটি নরনারী চলিতে চলিতে বুক ভরিয়া মুক্তির নিশ্বাস লইতে লাগিল।

গ্রাম

শিক্ষা প্রচারের দ্বারা গ্রামের উন্নতি করা যায়—নন্দলালবাবুর এই বিশ্বাস ছিল। একদা সংবাদপত্রের এক বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, বাঙলার এক পাড়াগাঁয়ের কোনো বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে। নন্দলাল তাঁর পূর্ব যোগ্যতা পরিচয়ের একখানা তালিকাসমেত দরখাস্ত পাঠালেন। যথাকালে উত্তর এলো। তাঁর চাকরি হয়েছে। মাসিক পারিশ্রমিক চল্লিশ টাকা।

বিপত্নীক নন্দলালবাবুর আসবাব বাহুল্য নেই। পাকশাক, শয্যারচনা, গৃহ সম্মার্জনা প্রভৃতি স্বহস্তে। পরমুখাপেক্ষা তাঁর নেই। নিরাহ, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ সন্তান—নন্দলালবাবু দুএকটা পোঁটলাপুঁটলিসহ শুভদিনে শুভক্ষণে যাত্রা ক'রলেন। এই হতশ্রী কালকাতা সহরের উত্তেজনা এড়িয়ে শান্ত প্রসন্ন পল্লীগ্রামের সরল জীবন যাত্রার মধ্যে ফিরে যাওয়া—বিধাতার আশীর্বাদ না হ'লে এমন সৌভাগ্য ঘটেনা। নাগরিক-বিলাসের খপ্পরে আর তিনি ভুলবেননা। মনে মনে স্বদেশী শাস্ত্র আউড়িয়ে বললেন, Go back to village, you civilized fools!

গ্রামের স্টেশনে তাকে খাতির ক'রে নিয়ে যাবার লোক ছিল। গুটিকয়েক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে, জনদুই গেঞ্জি-গায়ে-চড়ানো শিক্ষক—পায়ে তাদের কাদা মাখামাখি, হাতে চটিজুতো,—একখানা গোরুর গাড়ী আর গাড়োয়ান,—এরা এসেছিল তাঁর অভ্যর্থনায়। আরো একজন ছিলেন, তিনি রায় সাহেব গিরীশ মাইতি, স্কুল-কমিটির

প্রেসিডেন্ট। তিনি এগিয়ে এসে নন্দলালকে হাত ধ'রে নামালেন। বললেন, এসো বাবাজি, বাসা তৈরি আছে, কিছু অসুবিধে নেই। জল তোলা, রান্নার বন্দোবস্ত সব প্রস্তুত। ওরে, গাড়ীখানা এগিয়ে আন্ রতনা। চারটি খড় পেতে দে বাবা।

রতন গাড়ীওয়ালা বললে, খড় কুথা কর্তা, এবার ধান হইছে নাকি?

ওঃ তা বটে, বুঝলে বাবাজি, বন্যায় এবার ভাসিয়ে নেছে সব। আচ্ছা নে মালপত্তর তোল্, বেলা থাকতে পৌছে দিবি। আবার হাত কচলান কেন? পাবিরে, বক্‌শিস পাবি, বাবু কি আর ফাঁকি দেবে?

এজ্ঞে বাবু, অগ্রিম পয়সাটা,—আপনি আইলেন সেথার শহর থিগে, দিবো ব'লে পাচার। গরীবকে মারলেন।

রায় সাহেবের চোখ রক্তবর্ণ হ'য়ে এলো। নন্দলাল তাঁর অপমানিত মুখের দিকে চেয়ে রতনের হাতে চার আনা পয়সা দিয়ে বললেন, আচ্ছা বাপু, অগ্রিমই দিলুম, চলো এখন।

দুজনে গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ী চলতে লাগল। অন্য দুজন শিক্ষক চললেন পদব্রজে। কিছুদূর গিয়ে নন্দলাল পোটলা-পুঁটলির দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, দেখা গেল খাবারের পুঁটলিটি নেই। খোঁজাখুঁজি করতে দেখেই গিরীশ বলেন, হারিয়েছে ত? আমি জানি ওই বাটা-বেটিরা যখন একবার ঘেরাও করেছে, কিছু না হাতিয়ে ছাড়বেনা।

কাদের কথা বলছেন?—নন্দলাল বললে।

ওই যে ন্যাংটা ছেলেমেয়েগুলো! এবছর ভারি দুর্ভিক্ষ, বুবাবাজি, যেমন ম্যালেরিয়া তেমন অনাহার। নিয়েছে ওরাই অঠিক জানি। অসভ্য, বর্বর, দেখতে পেলে কান ছিঁড়ে নেবো।

নন্দলাল বললেন, যাক্ গে, নিয়েছে ছেলেমানুষ, আপনি রা করবেননা।

পথের কাদা হাঁটুর উপরেও ছাড়িয়ে উঠেছে। আশেপাশে অন্ধকার—বাঁশের বন, শ্যাওড়ার ঝোপ, কোথাও কোথাও কয়েকটা শালের গাছ,—দিনের বেলায়ও পথ অন্ধকার। গ্রামের চেহারা দেখে নন্দলালের মন কিছু বিমর্ষ। জলাশয়গুলি জঙ্গলাকীর্ণ, জলের চেয়ে সেখানে কাদার ভাগ বেশি।

স্কুল বাড়ীর কাছাকাছি একটা মাটকোঠায় শিক্ষকগণের বাসা। নীচেটা পাকা, উপরটা কাঁচামাটির তৈরী, ঘরের দরজায় খোলার আবরু। উপরে উঠবার সিঁড়ি নেই, কাঁচামাটির সঙ্গে ইট পাটকেল মিশিয়ে কয়েকটা ধাপ তৈরী করা হয়েছে মাত্র। একতলার খুপরিগুলো অন্ধকার, রাত্রের দিকে যে কোনো জীব জানোয়ারের সেখানে অবাধ চলা-ফেরা ঘটতে পারে। সীমানা-প্রাচীর নামক কোনো পদার্থ খুঁজে পাওয়া গেলনা। নন্দলাল এই স্বেচ্ছানির্বাসনের গুহার মধ্যে প্রবেশ ক'রে মনে মনে বললেন, 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা!'

তাঁর জিনিসপত্র উপরে উঠে গেল। রায়সাহেব গি—শ মাইতি বিদায় গ্রহণ কালে বললেন, অসুবিধে হ'লেই আমাকে খবর দিয়ো বাবাজি। ওরে নিকুঞ্জ—

উপর থেকে আওয়াজ এলো, এইজ্ঞে?

খাটখানা পাতা আছে ত?

আছে না? নিকুঞ্জ জবাব দিল।

তবে আর কি। বিশ্রাম করো গে বাবাজি। রান্নার ব্যবস্থা নিকুঞ্জই ক'রে দেবে, ও এই স্কুলের অনেক কালের পুরনো চাকর। ওর যত্ন দেখবে বাবাজি।—এই ব'লে গিরীশ মাইতি তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

উপরে এলে নিকুঞ্জ গড় হ'য়ে প্রণাম করলে। হাতযোড় ক'রে বললে, ঘরকন্না সব ক'রে দেবো মাষ্টারবাবু। আমি আপনার সেবাদাস।

ঘরকন্না!—নন্দলাল একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, আমার আর কি ঘরকন্না ভাই,—এক মুঠো রান্না, একটু জল তুলে দেওয়া,—আর বাদবাকি আমি নিজেই সব ক'রে নিতে পারব।

এইজ্ঞে সে কি কথা—আপনি একা মানুষ। এখানে বুঝলেননা যাঁরা আসেন তাঁরা থেকেই যান।—দাঁড়ান্, আমি পা ধোবার জল এনে দিই।—এই ব'লে নিকুঞ্জ চলে গেল।

ঋতুটা শরৎকালের শেষ। কিন্তু কবিকল্পনার কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সে গ্রামে খুঁজে পাওয়া যায়না। ঝোপে, ঝাড়ে, বনময় জটলায় ঝাপসা অন্ধকারে সমস্ত গ্রাম যেন দম আটকে রয়েছে। গাছের পাতাটি নড়েনা এমনি গুমোট। জলে কাদায় চারিদিক স্যাঁৎসেঁতে। সম্মুখে স্কুলবাড়ীটা যেন প্রেতপুরী ব'লে মনে হয়! নন্দলাল শহুরে মানুষ, নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত,

তিনি যে এখানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বসবাস করতে এলেন এ কথা কল্পনা করে তাঁর উৎসাহ যেন স্তিমিত হ'য়ে এলো। চাকুরী দরখাস্ত দেবার সময় যে গ্রামের কথা তিনি মানশ্চক্ষে দর্শন করে ছিলেন এ-গ্রাম সে নয়। সেই গ্রামের স্বচ্ছ নীল সরোবরে ছি শ্বেত ও রক্তপদ্ম, এ গ্রামের ডোবায় কেবল কচুরিপানা। তাঁ কল্পিত গ্রাম—শিক্ষায়, বলশালীতায়, সভ্যতায়, ঐশ্বর্যে ছিল নন্দন কাননের মতো,আর এ গ্রাম—এ যেন নগরগুলির আবর্জনা ফেলবা আস্তাকুড় মাত্র। কিন্তু নন্দলাল হতাশ হ'লেননা, মনে মনে তাঁ এই নির্বাসিত গ্রাম্য-জীবনকে সহনীয় ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলেন।

কয়েকটা কুকুরের চীৎকারে তিনি সচকিত হ'য়ে উঠলেন। দেখলেন একদল কুকুর কামড়া-কামড়ি করতে-করতে উঠানে এসে হাজির। কিন্তু তাদের ভক্ষ্য বস্তুটির দিকে চেয়ে নন্দলাল অকস্মাৎ শিউরে উঠলেন। ডাকলেন, নিকুঞ্জ, ও নিকুঞ্জ—?

এই যে বাবু, জল আনছি।—ব'লে বালতিতে জল নিয়ে নিকুঞ্জ হাজির।

নন্দলাল বললেন, কুকুরের মুখে ওখানা কি হে?

গলা বাড়িয়ে দেখে নিকুঞ্জ বললে, ও কিছু না! মাষ্টারবাবু, মানুষের হাত একখানা।

মানুষের হাত!

এইজ্ঞে, ম্যালেরিয়া মহামারি কি না, সৎকার করবার মানুষ থাকেনা ত, তাই ফেলে দেয় এখানে ওখানে।—আসুন বাবু, মুখ-হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হোন্।

নন্দলালের তখন সর্বশরীর থর্ থর্ করছে। সমস্ত গ্রামখানা মিলিয়ে যেন একটা বিভীষিকা। তিনি ঢোক গিললেন।

সেই রাত্রে নন্দলাল স্বপ্ন দেখলেন, অদৃশ্য কঙ্কালের একখানা হাত অস্থিসার বীভৎস অঙ্গুলিসংকেতে তাঁকে বলছে, 'সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।'

মাস দুই চাকুরির পরে নন্দলাল শয্যা আশ্রয় ক'রলেন। স্কুলটা চলছে, সুতরাং তাঁর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। ছেলেদের সেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্র। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সেখানে শাসনপদ্ধতি প্রয়োগ করা চলেনা। শাসন করতে গেলে তাদের মা-বাপ এসে গাল-মন্দ দিয়ে চলে যায়। ছেলেদের স্কুলের মাইনে চাইলে বলে, এবার হাজামজা।

নন্দলালের ম্যালেরিয়া জ্বর। বলা বাহুল্য চিকিৎসার ভার নিকুঞ্জেরই উপর। সে-ই নাড়ি টেপে, দুধসাগু আনে, কুইনিনের মোড়ক আনে দূরের ডাকঘর থেকে।

নিকুঞ্জ বলে, ভাত পেটে পড়লেই জ্বর যাবে।

নন্দলাল ভাবেন, চাকরি আর জ্বর—দুটোই না ছাড়লে জীবনের আশা নেই।

রাত্রের দিকে জ্বর আসে। জ্বরে বেহুঁস। উপবাসে রাত্রি কাটে অঘোরে। কিন্তু সেদিন তাঁর ঘুমের কিছু ব্যাঘাত ঘটলো। রাত্রি ঘন, এই পর্যন্ত প্রহরের কোনো নির্দেশ নেই। শৃগালেরাও সেদিন নিস্তব্ধ। সহসা নন্দলালের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হোলো তাঁর ভাঙা নড়বড়ে তক্তার ধারে কিসের খস্ খস্ শব্দ। সাপের

আনাগোনা ঘরে চলে এ অনেকদিন তিনি আলো জেলে দেখেছেন, তবে ব্রহ্মশাপ না থাকলে নাকি সর্পাঘাত হয়না,—অতএব নিশ্চিন্ত নন্দলাল পুনরায় ঘুমোবার চেষ্টায় পাশ ফিরলেন, কিন্তু পুনরায় তাঁর শয্যার ধারে আঁচড়কাটার শব্দ শোনো।—জন্তু জানোয়ার? হবে বা! সেদিন এক নিদ্রিত শিশুকে নিদ্রিত মায়ের পাশ থেকে কোন্ এক জন্তু মুখে ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। মা অন্ধকারে উঠে খুঁজে বেড়ালো, গ্রামের লোক জাগলো কিন্তু শিশুর সন্ধান পাওয়া গেলনা!—ভূত প্রেত? সে তো মনের ভয়, একটা সংস্কার মাত্র!

তক্তাখানা আর একবার নড়তেই নন্দলাল গলার আওয়াজ দিলেন। নিজের আওয়াজেই নিজের একটু সাহস বাড়লো। জ্বরটা কিছু কমেছে এতক্ষণে, অতএব তিনি উঠে দেশলাই খুঁজে হারিকেন জ্বাললেন। আলো জ্বলতেই অকস্মাৎ তিনি ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। এ যে ভূতের চেয়েও ভয়ঙ্কর—এ যে মানুষ—এ যে স্ত্রীলোক!

নন্দলাল চীৎকার করলেন, কে তুমি?

কৃষ্ণবর্ণা রাঙা শাড়িপরা একটি স্ত্রীলোক। সে সঙ্কুচিত হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো। বললে, চেঁচাও ক্যানে, আমার কি দোষ?

কেন এসেছ তুমি এ ঘরে?

এসেছিনু দেহ্‌লাই খুঁইতে!

দেশলাই খুঁজতে? বদমায়েস, পাজি, ইতর! বেরোও, শীঘ্র বেরোও বলছি—নিকুঞ্জ, ও নিকুঞ্জ—

নিকুঞ্জ কাঁচা ঘুম ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ভিতরে

ঢুকে সে বললে, বটেই ত, বটেই ত, এ কি অন্যায়। বুঝলেন না মাষ্টারমশাই, ও আমাদের তিলিবরের মায়া—বেরো, বেরো হতভাগি, মানুষ চিনিসনে—বেরো—বেরো—

স্ত্রীলোকটি বললে, এই ঘর না বলেছিলে তোমরা ?

তোর মাথা! হতভাগি, ব্রহ্মশাপের ভয় নেই ? যা, যা পালা। বুঝলেন বাবু, ওর ঘর ভুল হয়েছিল। নচ্ছার, নচ্ছার আর কাকে বলে! আপনি শুয়ে পড়ুন,—আহা একে অসুখ শরীর, উপবাস চলছে। ছি—ছি—

স্ত্রীলোকটি গা ঢাকা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

নন্দলালের সর্বশরীর তখন ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। রুগ্ন শরীরে তক্তাপানার উপর ব'সে প'ড়ে তিনি ঢোক গিলে বললেন, ব্যাপারটা কি নিকুঞ্জ ?

নিকুঞ্জ হাত কচলিয়ে বললে, অপরাধ না নেন্ ত বলি।

বলো!

মাষ্টাররা মাইনে ত আর পায় না, তাঁরা থাকবেন কিসের জন্যে—

ও বুঝেছি। রায় সাহেব জানেন এসব ?

নিকুঞ্জ সবিনয়ে বললে, তিনি অন্তর্যামী। বিধি ব্যবস্থা সবই ত তাঁর হাতে বাবু। নিন্, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন, ফাঁড়া উৎরে গেছে। হরিবোল, হরিবোল।

নন্দলাল গম্ভীরভাবে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও, আলোটা আর থাক। কাল এর বিহিত হবে।

নিকুঞ্জ অন্ধকারে একরূপ বক্র হাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন গিরীশবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। নন্দলাল অনুযোগ ক'রে বললেন, এসব কি ব্যাপার বড়বাবু? কালরাত্রে বিশ্রী সব কাণ্ড কারখানা—

গিরীশবাবু হেসেই অস্থির। বললেন, আর বলতে হবে না বাবাজী। চার পুরুষ কাটলো এই গ্রামে। বুঝতে পারলাম না, এদের তল পেলাম না। আরে রাম বলো, রাধামাধব, মধুসূদন—

আপনি শুনেছেন কিছু?

শুনতে হবে? নাড়ি-নক্ষত্র জানি যে। একেবারে চাষা, কোনো রুচিজ্ঞান নেই, অপোগণ্ড। যাও বাবাজি, তোমার আর ভয় নেই। তুমিই পারবে, তোমারই হাতে এদের মানুষ করার ভার রইল!—এই ব'লে রায় সাহেব নন্দলালের মনে আশা ও আশ্বাস ধ্বনিত ক'রে প্রস্থান করলেন। নন্দলাল অবাক হ'য়ে তাঁর পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

মাসিক বেতনাদি পাওয়া যায়নি। দুরন্ত অসভ্য ছাত্রদলের ব্যবহারে নন্দলাল অতিরিক্ত ক্লান্ত। এর ওপর গ্রামের কোন কোন মাতব্বর ক্লাসে ঢুকে সময় সময় নানারূপ অধ্যাপনারীতি নিয়ে গবেষণা ক'রে যায়। স্কুলে তাদের বে-আইনী প্রবেশ নিয়ে নন্দলাল অনুযোগ করেছেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। দিনে দিনে জানা গেল এই স্কুলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এই বিদ্যালয় যেন গ্রামের চরিত্রের অবনতি ও অধঃপতনের সাক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছে, দারিদ্র্য আর অশিক্ষার এ যেন একটা উজ্জ্বল উদাহরন। নন্দলালের সকল আশা ও আদর্শ নির্মূল হ'তে লাগলো।

সুমুখে বড়দিনের ছুটি। জ্বরটা যদিচ নিরাময় হ'য়েছে কিন্তু নন্দলাল স্থির করলেন, ছুটিতে কলিকাতায় গিয়ে তাঁর নবসঞ্চিত প্লীহা ও যকৃতের কিছু চিকিৎসা করাবেন। বলা বাহুল্য বেতন আজও কিছু পাওয়া যায়নি।

স্কুল বন্ধের আয়োজন চলছে এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নের দিকে স্কুলঘরের বাইরে রূঢ় গলায় আওয়াজ শোনা গেল, ওহে হেট্ মাষ্টার, আছো নাকি ঘরে?

উত্তর না দিতেই একটি আধাবয়সী লোক আদুড় গায়ে ঘরে এসে ঢুকলো। নন্দলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কি চাই আপনার?

বলো দিকি আমার ছেলে পাস করেনি কেনে? ছেলে পাস করেনি কেনে বলো শিগগির।

নন্দলাল বললেন, বসুন, বসুন আপনি, উত্তেজিত হবেন না। আপনার ছেলের নাম কি? কোন্ ক্লাস?

লোকটা কিন্তু শান্ত হোলো না। চোখ রাঙিয়ে বললে, খাতা দেখো, নাম রতন মান্না, পাঁচের কেলাস,—ভারি হেট্ মাষ্টার হ'য়ে আইসো তুমি। পয়সা দিচ্ছি মাস মাস, ছেলের কিছু হয় না কেনে?

আপনি ঠাণ্ডা হোন্, বসুন, দেখি আমি।—নন্দলাল উঠে খাতাপত্র দেখতে লাগলেন।

ঠাণ্ডা খুব হইছি, আগে আগে, ও-সব ট্যাণ্ডাই চলবে না, বুঝলে

হেড্ মাষ্টার, ছেলে পাস না করলে ঘর জ্বালায়ে দিব। নচ্ছা কোথাকার।

নন্দলাল মুখ ফিরিয়ে বললেন, ও-সব অভদ্র কথা বলছে কেন? এটা স্কুল, আমার এখানে একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে

আরে রাখো রাখো, বড় বড় কথা কয়োনা। ভারি এসেছ তিনদিন মাতব্বরি ফলাতে। খাথ, খাতা খাথ আগে।

নন্দলাল খাতা খুঁজে বার করলেন। উল্টে-পাল্টে রতন মান্নার নাম বার ক'রে পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল, কিছুতেই তার পক্ষে পাস করা সম্ভব নয়। আড়াই শো নম্বরের মধ্যে মাত্র সাতাশ মার্ক পেয়েছে। কোনো শাস্ত্রানুসারেই তাকে বৈতরণী পার করা যায় না।

নন্দলাল বললেন, এ যে ভয়ানক নম্বর কম, এর কোনো আশা নেই।

লোকটা মুখবিকৃত ক'রে উচ্চকণ্ঠে বললে, রাখো তোমার কথা। পাস করিয়ে দিবে কিনা কও।

তার রুক্ষ মেজাজে নন্দলাল অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন, না, সে আমি পারব না।

পারবে না? আচ্ছা, সাবধান বলছি—

নন্দলাল কেবল বললেন, যান্ আপনি এঘর থেকে।

লোকটা চ'লে গেল। যাবার সময় আবার শাসিয়ে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে নন্দলাল বাসায় ফিরে এলেন। কাল থেকে স্কুল বন্ধ হবে। বিশ্রাম নেবার জন্য তক্তার উপর শুয়ে পড়তেই

নীচে গোলমাল শোনা গেল। মুখ বাড়িয়ে তিনি দেখলেন, নীচে একদল লোক মারমুখো। তাদের সঙ্গে রতন মান্নার বাপ একখানা রামদাও হাতে নিয়ে চিৎকার করছে, বেরিয়ে আয় শালা হেড্‌ মাষ্টার, কাটবো তোকে।

বাড়ী চড়াও করতেই নন্দলাল প্রমাদ গণলেন। এখনি ওরা উপরে উঠে আসবে। গ্রামে থানা নেই, চৌকিদার তার মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েছে দূরে কোনো এক গ্রামে। শত্রুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তাদের আস্ফালন প্রতিশোধ না দিয়ে ছাড়বে না।

এমন সময় নিকুঞ্জ এসে হাজির। বললে, বাবু, ক্ষেপে গেছে ওরা, সর্বনাশ হ'য়েছে। রতনার বাপ আগে ডাকাত ছিল। উপায়?

নন্দলাল একটা কাগজে লিখলেন, গিরীশবাবু, শীঘ্র আসুন। আমার জীবন বিপন্ন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে নিকুঞ্জ ছুটলো।

মিনিট দশেক পরে রণাঙ্গনে রায় সাহেব এসে উপস্থিত। তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, বেরো, বেরো বাটারা—হতভাগা। ভালো মানুষ তোরা চিনিসনে? যে তোদের আপন মানুষ তাকেই তোরা শাস্তি দিস? ওরে হুভাগা, ওরে পাষণ্ড, বেরো, দূর হ।

লোকগুলোকে তাড়িয়ে তিনি উপরে উঠে এলেন। বললেন, আর ভয় নেই, এসো বাবাজি। ওরা কেবল অশিক্ষিত নয়,

অজ্ঞান, অধঃপতিত। আমি শুনেছি সব, বুঝলে বাবাজি? দিয়ো হে, ছোঁড়াটাকে তুমি ওপর ক্লাসে তুলেই দিয়ো।' মরুক গে, ওর কিছু হবে না তাতে তোমার কি? কিছু হবে না, এদের কিছু হবে না,—তার জন্যে তুমি কেন প্রাণ খোয়াবে?

* * * * *

শেষ রাত্রির অন্ধকারে গ্রামের পথ জনহীন। বনময় অগম্য পথ বেয়ে নন্দলাল ষ্টেসনে এসে পৌঁছলেন। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে বিছানার পুঁটুলি। জ্বরে ও উপবাসে শরীর প্রায় অচল।

টিকিটবাবু তাঁকে দেখে বললে, মাষ্টারমশাই, আপনি নিজে এসব ব'য়ে নিয়ে এলেন? বাসায় লোক ছিল না?

নন্দলাল ছলছলে চোখে বললেন, আমার বোঝা আমাকেই বইতে হয় ভাই।

কিন্তু, ধরুন, আপনার এই অসুখ শরীর—

নন্দলাল মৃদু হাসলেন। বললেন, শরীরের অসুখটা সারাতে পারবো, কিন্তু যে-রোগ নিয়ে যাচ্ছি এর প্রতিকার হয়ত আর হবে না।

টিকিটবাবু তাঁর মুখের দিকে তাকালে।

নন্দলাল পুনরায় বললেন, তুমি ত' জানো ভাই, গোপনে চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু আবার আমি আসবো। জানি এরা দুষবে, তবু প্রার্থনা করি শেষের দিনের সেবা যেন এরা আমার হাতেই পেয়ে যায়।

একটু পরে গাড়ী এসে পড়লো। রাত্রি শেষের অন্ধকারে গোপনে অলক্ষ্যে তিনি গ্রাম ত্যাগ ক'রে গেলেন। কেবল শেষ মুহূর্তে সাক্ষী র'য়ে গেল টিকিটবাবুর স্তব্ধ বিমূঢ় দৃষ্টি—আর রইলো দরিদ্রা দুঃখিনী গ্রামের শীতার্ত সকাতর শেষ মিনতি। গাড়ী ছেড়ে দিল।

বায়ু

আমাদের ধর্মশালার উত্তর দিকে নদী। রাস্তা পার হইয়া নীচে নামিয়া গেলেই স্নানের ঘাট পাওয়া যায়। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলময় মাঠ। দূরে মেঘের গায়ে পর্বতশ্রেণী চিত্রপটের মতো আঁকা।

শীতের হাওয়া তীব্র। এ বেলায় বাহির হই নাই, উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চন্দ্রোদয় দেখিতেছিলাম; আজ রাত্রে পূর্ণিমার নিশিপালন। সন্ধ্যার পূর্বেই চাঁদ উঠিয়াছে; নদীর খরস্রোতের উপরে তাহার প্রতিবিম্ব ঝলমল করিতেছিল।

আমার সঙ্গী চাটুয্যে সাহেব তাড়াতাড়ি ওভারকোট চড়াইয়া লইলেন এবং আমি পুরু খদ্দরের চাদর জড়াইয়া আছি বলিয়া আমাকে কটূক্তি করিলেন; আমার সন্ন্যাসীপনা দেখিলে তাঁহার নাকি গা জ্বালিয়া যায়। আসিয়া পর্যন্ত তাঁহার এতবার গা জ্বলিয়াছে যে তিনি এখনও পুড়িয়া মরেন নাই কেন তাহাই ভাবি।

'যাবে নাকি হে?'

তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি পুনরায় কহিলেন, 'বাবা বিল্বকেশ্বরের মতন ঠুঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো একটু ঘুরে আসি।'

নদী এবং চাঁদের দিকে চাহিয়া আমি মনে মনে একটু কাব্যের আস্বাদ পাইতেছিলাম; কিছু অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, 'কোথায়?'

'শোনো কথা! দু' বেলায়, অত ক'রে ঘি-দুধ মারচো আর বেড়াবার বেলা পা ওঠে না? ভুঁড়ি কি সাধে হয়? মরবে একদিন উদুরি হয়ে। এখানকার জল হাওয়া ভালো তাই রক্ষে।'

'মানে, কি বলচো?'

'তোমার মাথা! গা জলে যায়।' বলিয়া চাটুয্যে সাহেব নীচে নামিয়া গেলেন। চা খাওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার এত রাগ। আমি চা খাই না।

আমার ভাবুলতার কারণ আমি জানি। কারণটা সামান্য। পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন এখানে আসিয়াছিলাম, এই ধর্মশালার ঠিক এই ঘরটিতেই আমাকে আস্তানা পাতিতে হইয়াছিল। একদিন ভোরবেলা দরজা খুলিয়া দেখি, আমার দরজার সুমুখে দুইজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া। বুঝিলাম তাহারা জায়গা পায় নাই। একজনের নাম আমার মনে নাই, কিন্তু অপর জনকে কখনও ভুলিব না। তাহার নাম সুরবালা। বলা বাহুল্য, নিজের ঘরখানা আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তাহাদের আসিবার প্রধান কারণ জানা গেল, তাহারা তীর্থগুরুকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে।

মধুর বর্ণনা করিব না। তাহাদের রূপ নাই, বয়স নাই, তাহাদের কাহারও সহিত ভালোবাসায় পড়িও নাই। সে-বয়স আমার গিয়াছে। কিন্তু দয়া করিয়া আমি যে তাহাদের আশ্রয় দিয়াছি এ-কৃতজ্ঞতা তাহারা ভুলিতে পারিল না।

সুরবালার মাথায় চওড়া সিঁদুর, পরণে রাঙা পাড় শাড়ী।

একদিন তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার সঙ্গিনী কহিল, 'পাগ্‌লি আপনার সঙ্গে অত কথা বলে আমার কিন্তু ভয় করে।'

বলিলাম, 'কেন ?'

'ওর মাথার একটু দোষ আছে। ভালোয় ভালোয় ওকে এখন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।'

মাথার দোষ সুরবালার দেখি নাই। স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয় লজ্জা-সরম, বিচার বিবেচনা, দয়া-দাক্ষিণ্য সমস্তই তাহার পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই। তাহার নিত্য পূজা, স্নান-দান, আহার-বিহার,—কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই। চেহারাটা কিছু রুক্ষ,—সেটা বোধ করি তেল না মাখা এবং একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণের জন্য। তাহার মুখে চোখে সংযম ও আত্মনিগ্রহের ছাপ দেখিয়া আমার কেমন যেন ভালোই লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহার মাথার দোষ আছে বলিয়া একটি মুহূর্তও সন্দেহ করি নাই।

তাহাদের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছি, সুতরাং তাহারা আমাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'ঘর ছেড়ে দেওয়াটা সামান্য কিন্তু রাঁধা পাওয়াটা সামান্য নয়।'

'ওমা, ওকি কথা ? আমরা শুদ্দুর, আগে ব্রাহ্মণের সেবা, তারপর অন্য কথা।'

বলিলাম, 'ব্রাহ্মণের পাতে ভাত দিলে শূদ্রের মহাপাপ।'

সুরবালা বলিল, 'পাপপুণ্য জানি নে, ঠাকুরের ভোগ'

রাত্রে তাহারা আমাকে বিছানা পাতিয়া দিতে লাগিল। আমার কাছে একখানা কম্বল ছাড়া আর কিছু ছিল না, তাহারা কাঁথা

দিল, বালিশ দিল। স্বার্থ ও সুবিধার সম্পর্ক কিছু নাই সুতরাং বড় সহজে তাহাদের আপন হইয়া গেলাম।

সুরবালার স্বামী সঙ্গে নাই কেন সে-প্রশ্ন করি নাই, তাহার সঙ্গিনীটি কতদিন বিধবা হইয়াছে তাহাও জানিবার ঔৎসুক্য আমার ছিল না। আমি তাহাদের বাজার করিয়া দিতাম ও ঘর পাহারা দিতাম। তাহারা মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত, স্নানে যাইত, ঠাকুর দর্শন করিত, গীতাপাঠ শুনিত। আমার কোনোটাই নাই, আমি চুপচাপ বসিয়া থাকিতাম।

আজ এই সন্ধ্যায় তাহার কথা মনে পড়িবার কারণ ছিল। একদিন ঠিক এইখানেই দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আপনি কাঁদেন কেন, কি দুঃখ আপনার?'

প্রশ্নটা ছিল আমার নির্বোধের মতো। মানুষের দুঃখভোগের কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলাম, আমি নয়। তীর্থপথে পা বাড়াইয়াছে স্ত্রীলোক, স্বামী তাহার সঙ্গে নাই, চেহারাটা রুগ্ন, সঙ্গে সন্তানও ছিল না, সংসারকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে,—এহাই ত তাহার যথেষ্ট পরিচয়? আমি তাহাকে প্রশ্ন করিয়া অনধিকার চর্চা করি কেন? বেদনার রহস্য জানিবার জন্য আমার কেন এই স্পর্দ্ধা?

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। সুরবালা রান্নাবান্না ফেলিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না।

তাহার সঙ্গিনী আসিয়া কহিল, 'দেখুন আপনি যদি পারেন ওকে ঠাণ্ডা করতে, আমার কথা কিছুতেই শুনবে না।'

আমি গিয়া বলিলাম, 'পরের হাতে রান্না খেয়ে একটু প্রশ্রয়

পেয়েছি। বামুনের ছেলে উপবাস ক'রে থাকব? বলি শুনচেন?'

'আঃ বিরক্ত করবেন না, যান্।'

তাহার কড়া জবাবে আঘাত পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এত অ পরিচয়ে মানুষকে যে এমন ঘা দিতে পারে তাহাকে মন্দ লোক বলিতে পারিব না। বলিলাম, 'যাবো কোথায়, ঘরখানা যে আমার।'

সে মুখ তুলিল, চোখের জলে তাহার চোখ সমস্ত ভিজা উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'ইঃ বামুন না ছাই। কী গুণ আছে আপনাদের? সব খারাপ, সব পাজি।'

তাহার সঙ্গিনী তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—'ছি ছোট মুখে বড় কথা? যাঁর কাছে উপকার পেয়েছ তাঁকে গালাগাল?'

'থামো, তুমি!'—সুরবালা উঠিয়া বসিল, 'উপকারটা কি? ওঁর ঘর? ওঁর দালান?'

হাসিয়া বলিলাম, 'ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে পুণ্য হয়নি আপনার?'

পুণ্য? পুণ্য হ'লে এই দুর্দ্দশা? এই মিথ্যে খোঁজাখুঁজি! এই মিথ্যে ঘোরাঘুরি?'—তাহার চোখে অজস্র জল আসিয়া পড়িল,—'নেই, নেই, নারায়ণ নেই, ভগবান নেই! গুরু মিথ্যে, ঈশ্বর মিথ্যে!'

আমি তাহার সঙ্গিনীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া এই

নিষ্ফল উত্তেজনার রহস্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিলাম। সঙ্গিনীটী মাথা হেঁট করিল। আজিও আমি সেদিনকার সেই উপবাসী সধবার কণ্ঠের চীৎকার ভুলিতে পারি নাই। নির্জন ধর্মশালার প্রতিটি কক্ষ তাহার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

মাত্র তিনটি দিন। কেবলমাত্র তাহাকে কাঁদিতেই দেখি নাই, হাসিতেও দেখিয়াছি। তাহার কৌতুকে আনন্দে এই ধর্মশালার ঘর ভরিয়া গিয়াছে। আমাকে ঠাকুর বানাইয়া পূজা করিয়াছে, আমার সহিত অকারণে বিবাদ বাধাইয়া একদিন আমাকে খাইতেও দেয় নাই। রাত্রে একদিন বন্ধ করিয়া বারান্দায় আমার বিছানা পাতিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে আমার চাটাইখানাও বিছাইয়া দেয় নাই। বায়ুরোগ বলিয়া মনে করিয়াছি, মাথার দোষ বলিয়া তাহাকে এড়াইয়া গিয়াছি।

মাত্র তিনটি দিন। ইহারই মধ্যে তাহার সঙ্গিনী বিধবাটি আমাকে জানাইয়াছিল, 'দেখছেন কি, আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়লে। আজ চার বছর আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে।'

বলিলাম, 'গারদে দিলে কেমন হয়?'

'চুপ, চুপ, শুনলে এখনি কেলেঙ্কারী করবে। ঠিক পাগল ত নয়।'

অল্প পাগল বলেই ত বিপদ। উনি কি আপনার বন্ধু?'

'না।'

'আত্মীয়? ভগ্নি?'

সঙ্গিনীটি এদিক ওদিক তাকাইল। মনে পড়ে সেই রাত্রেই

তাহারা এস্থান ত্যাগ করিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে একটু থতমত খাইয়া বলিল, 'ঠিক তয়ি নয়, আপনাকে বলতে অবশ্য বাধা নেই—'

'বাধায় দি থাকে তবে বলবেন না।'

সে কহিল, 'বলেই ফেলি। দেখুন, আমরা দুই সতীন। আমাদের স্বামী মারা গেছেন।'

'তার মানে?'

সে মাথা হেঁট করিয়া কহিল, 'আমার সতীন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ও তাঁকে খুঁজে বার করবে। স্বামী আমাদের বিদেশে থাকতে মারা গিয়েছিলেন।'

গত বৎসরেও একবার সুরবালাকে কলকাতার পথে দেখিয়াছিলাম। তখন অর্ধোদয় যোগের শহরপ্রাবী জনতা। সেই জনতার ভিতরে দেখিলাম, সুরবালা দ্রুতপদে চলিয়াছে। দুই পায়ে ধূলা ভরিয়া গেছে, রৌদ্রে আর পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহ, মলিন রাঙাশাড়ী পরণে,—আমাকে সে দেখিতে পাইল না, দেখিলেও সে চিনিতে পারিত না। কেনই বা চিনিবে?

কিছুদূর তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। মনে প্রশ্ন আসিল, সে কি খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহার পরমার্থকে? জীবন ভরিয়াই কি সে খুঁজিবে তাহাকে, যাহাকে পাওয়া যায় না? কিন্তু পথের মাঝখানে নিজেই থামিয়া গেলাম। কেন আমি তাহাকে ডাকিব?

কেন তাহার গতিতে বাধা দিব? সে চলিতে থাকুক। তাহার জীবনের সকল পথই তীর্থ-পথ!

চাটুয্যে সাহেব আসিয়া হাঁক দিলেন। তাঁহার চা খাওয়া হইয়াছে। আমি তখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। নদীর উপরে পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিতে দেখিতে আমার কিছু ভাবালুতা জাগিয়াছিল।

মেঠো ফুল

মেয়েটার জন্ম গরীবের ঘরে। সে যখন আঁতুড়ে তার মায়ের মাথার দোষ হয়। অনেক দুঃখ আর অনেক দুর্ভাগ্য সহ্য ক'রে বছর চারেক আগে মা মরেছে। বাপের কথা বলা বাহুল্য, কারণ সে লোকটা এতকাল বেঁচেছিল সংসারের বাহুল্য বস্তু হ'য়ে, সে তার অস্তিত্বের কোনো কৈফিয়ৎ দিতে পারেনি। মরবার পরে জানা গেল যে, সে বেঁচে ছিল এতকাল। পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে মেয়েটা কূলে কূলে ভেসে বেড়াতে লাগল।

নামহারা ঘাসের ডগার ফুল অযত্নে কোন্ মাঠের কোন্ প্রান্তে গজিয়ে উঠে খবর কেউ রাখেনা। নিভৃত আলো বাতাসের মন্ত্র পেয়ে তারি প্রাণের সঞ্চার হয়। মেয়েটা গরীবের, কিন্তু চেহারাটা গরীবের নয়। এপাড়া ওপাড়ায় অনাদরের অন্ন খেয়ে এবাড়ী ওবাড়ী ফাইফরমাস খেটে যেমন ক'রেই হোক কুঁড়িটা পাকলো। তার দিকে চেয়ে দেখার মতো কিছু পাওয়া যায়নি, তার খবর রাখবার সময় নেই কারো। সেই জন্ত মেয়েটা সাধারণের পর্য্যায়ে প'ড়ে গেল, বিশেষ একটা কিছু হয়ে উঠলোনা। পাড়ার গয়লানি তাকে দিলে একখানা কাপড়, বড়বাবুর মা দিলেন শীতের দি[illegible] একখানা দোলাই,—আর বললেন, নবীনের ছেলেমেয়ে দুটোকে একটু দেখা-শোনা করিস মা। বউমার শরীর খারাপ, ঝক্কি সামলাতে পারেনা।

নিতান্তই মেয়েটা যখন একটু ছাড়ালো হয়ে উঠলো তখন তার একটা নাম পাওয়া গেল। মা বাপ নাম রেখে যেতে পারেনি; ওপাড়ার দীনু ধোবার বৌ একদিন আদর করে তার নাম রাখলো, রাধা। বেশ নাম। সবাই তাকে ডাকতে লাগলো রাধা ব'লে। এই নামের বকশিসটা পাওয়ার কারণ ছিল। দীনু ধোবার বউকে মায়েটা এনে দিত ঘুঁটে, তার বদলে পেতো আমটা জামটা। দানুকে তামাক সেজে দিত, তার বদলে আধলাটা পয়সাটা। তারা বললে, ওলো, তোর নাম রইলো রাধা।

দুনিয়ার খবর পাওয়া যেতো রাধার কাছে। জামরুল গাছে ফল ধরলো কিনা, বেনেদের বউ কবে গিয়েছে শ্বশুরবাড়ী, রাখু বামুনির ছেলেটা কবে ডুবে মরেছে, গাজন বাড়ীর মহাজনদের ঘরে কবে ডাকাতি হোলো, মেয়ে চুরির মামলায় গ্রামে কবে এসেছিল দারোগাবাবু—এসব তার কণ্ঠস্থ। তারিখ পর্য্যন্ত সে আউড়ে যায়। স্মৃতিশক্তির পরীক্ষায় কেউ কোথাও জটলা পাকালে অমনি ডাক পড়ে রাধাকে। এমনি ক'রে দেখতে দেখতে মেয়েটার বয়স বারো বছর পেরিয়ে গেল।

বারো পেরিয়ে যাবার পরে রাধার গতিবিধিটা হোলো চন্মনে। ঘরে থাকবার মেয়ে সে নয়, বাইরে বাইরে কাটায় সারাবেলা। ব্যাঙের গর্তের ভিতর থেকে ব্যাঙ খুঁচিয়ে বা'র করা চাই, মাটি থেকে কেঁচো তুলে মাছকে খাওয়ানো, কুকুরের গায়ে ঢিল মারা, খড়ের মুড়ো

জেলে মরা শালিকের অগ্নি সংকার করা,—এমনিতরো নানা আবশ্যিক কর্তব্যের তাগিদে তার সারাদিন কাটে। এর পরেও থাকে নানা দৌরাত্ম্য। কাছেই গ্রামের নদী হৈমন্তী। ময়রাপাড়ার হারুকে নিয়ে সে হৈমন্তীর চড়ায় গিয়ে কলিমুদ্দির ডিঙিখানা খুলে দিয়ে আসে। অর্থাৎ তার একটা অদম্য কৌতূহল, দেখা যাক্‌না পরিণামটা কি দাঁড়ায়। হারুকে একদিন নদীর জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেটা ডোবে কিনা দেখার জন্য।

অপরাধের শাস্তিটাও সে সহ্য করে নিজের একটা অদ্ভুত নিয়মে। শাস্তিপালের হাতে মার খেয়ে পিঠখানা দুমড়ে গেল, কিন্তু কাঁদলোনা, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইলো ঠায়ে। পাকা পেয়ারা চুরির দায়ে বনমালী ঠাকুর তার মাথার অর্ধেক চুল কেটে দিলে কাঁচি দিয়ে—মেয়েটা কেবল মাঠের ধারে গিয়ে চুপি চুপি মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে, কেমন ছিরিটা তার দাঁড়ালো। লাঞ্ছনাকে সে ভয় করেনা, প্রহারের চোট সহ্য করা একপ্রকার তার স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তার মন কেবলই জানতে চায়, এর পরে কি আছে। এদের ভিতর থেকে এই কথাটা সে শিখলো মানুষের কাছে তার পাওনা কিছু নেই, মানুষ নামক জীবটা ভয়ানক অত্যাচারী।

বারো উৎরে তেরোয় পা দিয়ে তাকে আস্ত একখানা কাপড় পরতে হোলো। গরীব ব'লে চেহারাটা গরীবের মতো নয়, গড়নটা বাড়ন্ত। ফলের রংটা বদলে গেল, মর্মে এলো রস। কারো বাড়ী কোমর বেঁধে জল তোলে, কারো ছেলে ধরে, কারো অসুখে রাত

জেগে পাথায় বাতাস করে। এক বাড়ীতে চারটি খায়, এক বাড়ীতে গিয়ে কাজ ক'রে দেয়, আবার কোথাও গিয়ে গরুর জাব দিয়ে আসে। গোটা তিনেক বিড়াল ছানা একবার সে এক জায়গায় আবিষ্কার করলে। নিষ্প্রয়োজনীয় অনাদৃত তিনটি জীব। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কাঁদে, শীতের ঠাণ্ডায় ককিয়ে উঠে, ক্ষুধায় আধমরা হয়ে ধোঁকে। রাধা তাদের সেবায় লেগে গেল। নিজের দ্বিতীয় বস্ত্রখানা ছিঁড়ে তাদের সুখশয্যা প্রস্তুত করলে। নবীনবাবুর ঘর থেকে দুধ আনতে লাগলো চুরি ক'রে, তারপর তাদের কাছে ব'সে থাকতে লাগলো সারাদিন। ক্লান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই, স্নানাহারের তাগিদ নেই—রাধা তার স্ফুটনোন্মুখ নারীত্ব নিয়ে অশ্রান্ত সেবায় তাদের আগলে রইলো।

অবশেষে একদিন প্রভাতকালে আবিষ্কার করা গেল দুটো বিড়াল ছানা কোথায় অদৃশ্য, এবং তৃতীয়টা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে প'ড়ে রয়েছে দূরে। শৃগালের উৎপাতটার কথা আগে রাধার মনে হয়নি। সেইদিন কেবল,—তার তেরো বছরের জীবনের মাত্র ওই একটিদিন তার চোখে জল নামলো ঝরঝরিয়ে। সেদিন সে যেন প্রথম কাঁদতে শিখলো। জানা গেল এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে দুর্ভাগ্যই কেবলমাত্র নেই, বেদনাও আছে। সেদিন বেদনার জন্ম হোলো। রাধা যেন শিউরে উঠে চাইলো নিজের দিকে। এই কথাটা সে প্রথম অনুভব করলে, যারা সবল তারা নিরপরাধের কণ্ঠ অকারণে টিপে ধরে, মানুষ অহেতুক মার খায়, অযথা অপমানিত হয়, অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হয়। এতদিন ধ'রে নিজেকে সে অপরাধী মনে ক'রে

লাঞ্ছিত হ'য়েও হাসিমুখে সহ্য করেছে, আজ সে আবিষ্কার করলে, সে জীবনে কোনোদিন অন্যায় কিছু করেনি, কেমন একটা নিয়তির চক্রান্তে, ভাগ্যের এক অদ্ভুত বিড়ম্বনায় সে পদে পদে অনাদৃত হ'য়ে এসেছে।

অকস্মাৎ একদিন রাধার এক পিতৃব্য আবিষ্কৃত হোলো। আরাকপুরের মেলায় গিয়ে নবীনবাবুর মা সেই পিতৃব্যকে চিনতে পারলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে ডেকে বললেন হরিসাধন, চিনতে পারো বাবা?

পারি বৈ কি মাসিমা? কেমন আছেন?

তুমি ত বাবা আজ ন'বছর গাঁ ছেড়েছ? দেখো দেখি এই মেয়েটাকে, এটি তোমার ভাইঝি। ওলো, কাকার পায়ের ধুলো নে। মেয়েটা দেখতে দেখতে বড় হ'য়ে উঠলো। আমাকে ধ'রে বসলো, মেলায় নিয়ে চলো দিদিমা। বললুম তা চল,— বাপটাও ম'রে গেল হরিসাধন, ছুঁড়ির আর কেউ রইলোনা। একেবারে জন্মদুঃখী।

পরিচয়টা কাজে লাগলো। হরিসাধনের ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। স্ত্রী রুগ্ন। বাপের বাড়ী থেকে যাবে কলকাতার বাসার। বললে, বেশ ত' ভাইঝিকে যখন পাওয়াই গেল তখন আর ছেড়ে দেবোনা মাসিমা। চলুক আমার সঙ্গে কলকাতায়।

নবীনবাবুর মা বললেন, বেশ বাবা, বেশ, এতদিনে ছুঁড়ির কপাল

ফিরলো। তোমার কল্যাণ হোক বাবা, মেয়েটাকে তুমি নিয়েই যাও।' কল্‌কাতায় বেশ থাকবে।

কল্‌কাতা! রাধা অবাক হ'য়ে গেল। অনেক কাল আগে কোথায় কার কাছে যেন কল্‌কাতা শব্দটা শুনেছিল, ঠিক মনে নেই। সে একটা খুব অদ্ভুত দেশ। সবাই সেখানে জুতো পায়ে দেয়। সেখানে সাহেব নামক এক প্রকার জীব আছে। রেল গাড়ীতে ক'রে সেখানে যেতে হয়।

কেমন একটা প্রবল উত্তেজনায় রাধার বুকের ভিতরটা আনন্দে ও আশঙ্কায় ধক্ ধক্ করতে লাগলো।

* * * *

রাধা এলো কল্‌কাতায়। একেবারে অবাক। এত মানুষ, এত গাড়ী ঘোড়া, এত কর্মব্যস্ততা। অদ্ভুত এই ঘটনাটা তার জীবনে। যেন একটা বিশাল মৌচাক, লক্ষ লক্ষ মৌমাছি চারিদিকে গুন গুন করছে। একটা বিরাট যন্ত্র যেন ঘর ঘর ক'রে ঘুরছে, অগণন মানুষ সেই যন্ত্রটার চাকায় বাঁধা। কিম্বা অমনি একটা কিছু।

অস্বাভাবিক একটা কিছু। বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের তরঙ্গ। রাধা তার বুনো দৃষ্টি মেলে দিয়ে নির্বোধ সরলতায় চেয়ে চেয়ে দেখে। বুনো বৈ কি। তার চোখে হৈমন্তী নদীর ছায়া তার গায়ে দিগন্ত জোড়া মাঠের গন্ধ, তার কপালের আঁচলে এসেছে বনময় গ্রামের আভাস। এদেশ কোথায় ছিল? তবে কি পৃথিবী এত বিশাল?

পিতৃব্যটি কোন্ এক কারখানায় কাজ করে। স্ত্রী রোগা, চারটি ছেলেমেয়ে। শহরের এক প্রান্তে অতি জীর্ণ দুখানি ঘর ততোধিক জীর্ণ ঘরকন্না পেতে স্বামী স্ত্রী বাস করে। রাধা আসতেই সমস্ত কাজের বোঝাটা তার ঘাড়ে পড়লো। কাকা ও কাকী বাঁচলো। বিনা বেতনে এমন দাসী পাওয়া কঠিন।

অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার কৃতিত্ব মেয়েদের জন্মগত। সেই রাধা হোলো সংসারী। এবং বিস্ময়ের কথা এই যে শ্রীমতী রাধা দেখতে দেখতে দুমাসের মধ্যে স্বাস্থ্যবতী হ'য়ে উঠলো।

কাকা বললেন, আমার ভাইঝি ত বটে।

কাকী বললেন, চুরি ক'রে খায় নিশ্চয়ই।

চুরি ক'রে খায় কিনা জানা গেলনা। কিন্তু নূতন মাটির রস টেনে শুকনো চারাটা নধর হয়ে গজিয়ে উঠলো। কলকাতার জল হাওয়া ভালো। মানুষ যার সম্বন্ধে এতকাল কার্পণ্য করেছে বিধাতা তাকে তাচ্ছিল্য করতে পারলেননা। তিনি দু'হাত ভ'রে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিলেন রাধার অঙ্গে অঙ্গে। মানবলোকে যে ছিল নগণ্য, ঋতুরাজের কাছে সে হোলো অগ্রগণ্য। খোলা একরাশ পিঠভরা চুল, যেমন-তেমন পুরনো একখানা শাড়ী, কাঁচের দুগাছা চুড়ি হাতে, মুখে পরিচ্ছন্ন কৌমার্যের সরলতা—এছাড়া আর কোনো সম্বল নেই। কিন্তু এইটুকুই অনেক, এইটুকুতেই যেন ভুবনমোহিনী মায়া। সৃষ্টির রহস্যের আদিম ভাষাটা যেন তার যৌবনোচ্ছলতায়

পাঠ ক'রে নেওয়া যায়। জীবন রঙ্গমঞ্চে রাধা এসে দাঁড়ালো নূতন ভূমিকা নিয়ে।

নূতন ভূমিকায় অভিনয়ের আরম্ভে আমি রাধাকে দেখলুম। আগে গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু নিখুঁৎ অভিনয়ের আকর্ষণে আমাকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে হোলো।

স্বভাবের অদ্ভুত তাড়নায় জানি প্রকৃতি আপন কাজ ক'রে যায়। ভ্রমরের জন্য ফুল ফোটে, না ফুলের জন্যই ভ্রমর জন্মায় এ তত্ত্বের সমাধান আমার হাতে নেই। আমি জানি আদিম নিয়মে সমস্তরই পিছনে আছে গতিশক্তি। এই গতিশক্তির জোয়ার রাধার মধ্যেও দেখা দিল। সৃষ্টির নীতি রাধাকেও তার পরম প্রয়োজনে ব্যবহার করতে লাগলো। ঘাসের ডগায় যে ফুল ফুটেছিল কোন্ অজানা প্রান্তরের অলক্ষ্য কোণে, তাকে বাতাস দিয়ে গেল প্রাণ-মন্ত্র, বর্ষাধারা দিল সজীবতা আর বসন্ত দিল মধু—এবং ভ্রমর এলো হাওয়ার পথ চিনে চিনে।

একদিন সেই দৃশ্যটা দেখলুম। আমাদের পাড়ার নামজাদা সচ্চরিত্র যুবক অজিত আলাপ করছে গোপনে রাধার সঙ্গে। অভিনব দৃশ্য। এর মধ্যে সামাজিক সমস্যা থাকে থাক্ কিন্তু প্রকৃতি তার পাওনা বুঝে প'ড়ে নিচ্ছে নরনারীর কাছে। বিষয়বস্তুটি চিত্তগ্রাহী; নায়ক-নায়িকার অভিনয় মনোরম, স্থানকাল ও পাত্রপাত্রীর মধ্যে যথেষ্ট বাস্তব সঙ্গতি বর্তমান।

যে কারণেই হোক ওদের আলাপটা ভালো লাগলো। কথা

নেই আছে ভঙ্গী, ভাষা নেই আছে আগ্রহ, উদ্দেশ্য নেই আছে আকর্ষণ। ওদের আকর্ষণ বিকর্ষণের পালাটা আমি যত দূর জানি কয়েক মাস ধ'রে চলতে লাগলো। রাধা সকালে উঠে আসে ছাদে এক মোট ভিজে কাপড় চোপড় হাতে নিয়ে, অনেকক্ষণ ধ'রে সেগুলো শুকোতে দেয় এখানে ওখানে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাকুল দৃষ্টি অজিতের শোবার ঘরের জানলায় প্রিয়কে খুঁজে বেড়ায়।

খুব সহজ, খুব সাধারণ এবং খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবকে মানুষই ক্ষুণ্ণ করে, কারণ মানুষের জীবন পদ্ধতিতে কেবলই ব্যতিক্রম, কেবলই অসঙ্গতি। আমার বুকের ভিতরকার রক্ততরঙ্গ টলমল করে, আমি ভাবি গল্পটার শেষ কোথায়! মেয়েটাকে দেখলে কেমন একটা বেদনায় মনের ভিতরটা টন্ টন্ করে। আমার প্রবীন বিচারবুদ্ধি কেবলমাত্র কৌতুক আর কৌতূহলে আচ্ছন্ন হ'তে চায় না, কেবলই কামনা করি মেয়েটা সুখী হোক, অভাগিনীর কল্যাণ হোক।

পাড়ার লোক কেউ জানে না, কেউ লক্ষ্য করে না। আমি কেবল বিশ্বের এই পরম তত্ত্বের একমাত্র রসগ্রাহী, একটি মাত্র নির্বাক দর্শক। উদ্বেগে রজনী আমার বিনিদ্র।

কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হোলো আমি কেমন ক'রে জানবো? শুধু দেখতে পাই সকালের নরম রোদ্রে মেয়েটি ছাদে এসে দাঁড়ায়, অজিত দেখা দেয় তার বাড়ীর জানলায়। এর চেয়েও বেশি। দেখি রাধা প্রণাম করে অজিতকে দূর থেকে, এলো চুল ছড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গে, দুটি সরল নিষ্পাপ চক্ষু পূর্ণ হয়ে ওঠে একটি করুণ

প্রত্যাশায়। আমি কল্পনাপ্রবণ সন্দেহ নেই, তবু রাধার দুই চক্ষু ভ'রে প্রত্যহ সকালে যে ভাবা ফুটে ওঠে তার মর্ম এই যে, আমার জীবনের মূল কেন্দ্রে তুমি ব'সে রয়েছ, আমার অস্তিত্বের অর্থই তুমি। হে আমার প্রাণ মন্দিরের তরুণ দেবতা, আমার সমগ্র জীবন একটি প্রণাম হ'য়ে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ুক।

অজিত হাসিমুখে জানলার কাছ থেকে স'রে যায়। পাড়ার এমন সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত ছেলে দ্বিতীয় নেই। প্রিয়দর্শন অমায়িক যুবক।

* * * *

নাটকটা পঞ্চাঙ্ক। চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত মেয়েটার জীবন অতি বিচিত্র। জীবনের ঘাটে ঘাটে এইটুকু বয়সে তাকে বহুবার নোঙর করতে হ'য়েছে। পঞ্চম অঙ্কে তার জীবনের যা হোক একটা পরিণতি।

অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। লোকালয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ঘটনা অসংখ্য। হৃদয়বৃত্তি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় মানুষের নেই। প্রতিদিন মানুষের ঘরে ঘরে এই ঘটনা এমনতরো আকর্ষণ বিকর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সংক্ষিপ্ত, করুণ, তুচ্ছ, হাস্যকর—নানা আখ্যায় একে ভূষিত করো, নানা রসে একে সংমিশ্রিত করো, একে বলো কুৎসিত, বলো সুন্দর, বলো মহিমান্বিত—তবু এর পরিচয়টা রয়ে গেল অসমাপ্ত। একে সৎ-সাহিত্য বলো, পরনোগ্রাফি বলো, আর্ট বলো, ছেলেমানুষী বলো —কিন্তু কিছুতেই এর আসল হদিস পাওয়া যাবে না।

এই কথাগুলোই ভাবছি এমন সময় আমাদের পাড়ায় শানাই বেজে উঠলো। সেই বাঁশীর আওয়াজটা গেল শূন্যের দিকে—যেদিকে হৃদয়হীন মহাকাল আবহমান কাল ধ'রে নিষ্ঠুর খেলা খেলে চলেছেন। বিশ্বের কোনো দুঃখ ও কোনো বেদনায় যাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। বাঁশীর শব্দটা বাজলো আমার রক্তে—একজন নির্বাক দর্শক, মানুষের কল্যাণ ও বেদনার প্রতিবিধানে যার কোনো হাত নেই তবু শানাই বেজে পাড়ায় পাড়ায় জানালে, আমাদের পাড়ার সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবক অজিতের বিবাহ বার্তা।

শঙ্খ, হুলুধ্বনি, বরবরণ, বরানুগমন, বিবাহ এবং নবোঢ়া বধূসহ রাজপুত্রের গৃহ-প্রত্যাবর্তন—প্রত্যেকটি ঘটনা বিষাক্ত তীরের ন্যায় দ্রুত গিয়ে বিদ্ধ হ'তে লাগলো একটি বনহংসীর নিষ্পাপ কোমল হৃদয়ে। কার অপরাধে? কে দেখলো সেই গোপনতম অশ্রু,—ঝরঝরিয়ে দরদর ধারায় যে রক্তবিন্দুগুলি ঝরতে লাগলো নীরব অন্ধকারে একখানি জীর্ণ ভূমিশয্যার প্রান্তে?

আর একদিন মেয়েটাকে দেখলুম। মাথা তুলতে পারলুম না। পুরুষ যে তাকে কেবল অপমান করেছে তাই নয়, পুরুষ হ'য়ে আমিও যেন অজিতেরই দৈন্যে অপমানিত হ'য়েছি—এই কারণেও।

সেটা দোল পূর্ণিমার সকাল। রাধা একটি বালকের কাছে হাত পেতে বলছে, আমাকে একটু আবির দে ভাই।

ছেলেটি তাকে দু'মুটো আবির দিল। হাত পেতে রঙ চেয়ে নিয়ে যাকে রং মাখতে হয়, বুঝতে হবে রঙ মাখাবার মানুষ তার জীবনে

নেই, রঙও নেই তার হৃদয়ে। নিজের সর্বাঙ্গে নিজেই রঙ মাখলো রাধা।• বিস্ময় রঙের উৎসব, আগুনের উৎসব,—সে কেন বিবর্ণ, কেন বর্ণহীন—কেন তার জীবন থেকে এমন ক'রে সমস্ত আগুনের খেলা নিঃশেষ হোলো? আজ এই সর্বস্বান্ত পথবাসিনী ভিখারিণীর দীনতা দেখে আমার চোখে জল এলো।

সেই দিন থেকে আর রাধাকে দেখিনি। কেন দেখিনি প্রশ্ন উঠতে পারে। সে দেখা দেয়নি ব'লে নয়, সেই দোল পূর্ণিমার রাত্রে রাধা তার কাকা ও কাকীর আশ্রয় ছেড়ে, ছোট ভাই বোনের মোহ কাটিয়ে, অজানা পথের দিকে যাত্রা করেছিল একাকিনী। এর মধ্যে দুটো কারণ থাকতে পারে আমার মনে হয়। প্রথমতঃ সে হয়ত মনে করেছে, নূতন পৃথিবী সে সৃষ্টি করবে নূতন রঙ মাখিয়ে, বিশ্বের থেকে মহা-বিশ্বের দিকে সে আবীরের আগুন ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাবে,—কিম্বা হয়ত সে চ'লে গেছে তার সেই পুরাতন অনাদৃত জীবনে—যেখানে অত্যাচার আছে প্রবল কিন্তু মহিমান্বিত প্রেমের অসম্মান নেই; যেখানে উপবাস আছে, দারিদ্র্য আছে কিন্তু প্রাণ নিয়ে নিষ্ঠুর ছিনিমিনি নেই। সেখানে আছে নির্জন গ্রামের নদী আদরিণী মৈনস্বী, আছে সেই ছোট মালতীর বেড়াঘেরা জামরুলতলা, আছে একটা বৃহৎ জীবন—যে জীবনে কোনো নিষ্ফল প্রত্যাশা নেই, উদ্বেগ নেই, স্বভাবের কোনো নিয়ম ব্যতিক্রম নেই। আমার ত' তাই মনে হয়।

একঘণ্টার নাটক

সমিতির অবস্থা প্রথম দিকে ভালো ছিল না, সুরঞ্জন রায় যেদিন সর্বোচ্চ সংখ্যার ভোট পাইয়া সভাপতি হইল, সেদিন হইতে সভ্য-সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুরঞ্জন বড়লোকের ছেলে, তাহার গাড়ী ও বাগানবাড়ী দুইই আছে। গত বৎসর এম-এতে ভালো নম্বর রাখিয়া সে মেডেল্ পাইয়াছিল। ছাত্রমহলে তাহার জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত।

আজ সকালে পোষ্টগ্রাজুয়েট্ ক্লাসের দুইটি মেয়ে তাহার সহিত দেখা করিয়া নমস্কার জানাইল।

সুরঞ্জন কহিল, বসুন। কাল ফোনে বলেছিলেন যে, আসবেন; আমি অপেক্ষা ক'রে রইলুম, এলেন না কেন?

স্নান করিয়া তাড়াতাড়িতে সুরঞ্জন একটা মট্‌কার গাউন্ গায়ে চড়াইয়া বাহিরহইয়া আসিয়াছে, ভিতরে আর কোনো জামা নাই। গাউনের সম্মুখভাগে শাদা সুতায় চমৎকার ফুল তোলা। সেই দিকে চক্ষের পলকে একবার চোখ বুলাইয়া সুপ্রভা কহিল, হঠাৎ অসুবিধেয় প'ড়ে গিয়েছিলুম কালকে। একলা আসতে মেয়েদের ভারি মুস্কিলে পড়তে হয়। এই ইনি, এঁর নাম লতিকা গুপ্ত, কাল আমার সঙ্গে এঁরও আসবার কথা ছিল, কিন্তু—

লতিকার সহিত সুরঞ্জনের নমস্কার-বিনিময় হইল। সুরঞ্জন কহিল, একলা আসতে মুস্কিল? কলেজে যান, শুনেছি প্রাইভেট্ টুইশনি করেন, তখন কে সঙ্গে যায়? আমার এখানে আসতেই বুঝি—

সুপ্রভা সেন কহিল, অত ক'রে যদি ক্রস্ করেন তবে—বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া সলজ্জ হাসিল।

লতিকা কহিল, গত বছরে কয়েকদিন মাত্র আপনাকে ক্লাসে দেখেছিলুম তারপরেই আপনি পাশ ক'রে চ'লে যান। এখন কি রিসার্চ নিয়েই থাকবেন?

সুরঞ্জন কহিল, না। শীঘ্রই একটা এক্সকারশনে যাবো, শিকারের সখও আছে।

সুপ্রভা কহিল, একটা পি-এইচ্-ডি যদি পান মন্দ কি? বোধ-হয় প্রফেসরির ওপর আপনার মোহ নেই?

দুইজনের দিকে সুরঞ্জন একবার চোখ বুলাইয়া লইল। কথা-বার্তাগুলি ব্যক্তিগত হইবার দিকে ঝুঁকিতেছে! ইহাকে এড়াইবার জন্য সে কহিল, দেখি কি হয়! হ্যাঁ, আমি বলছিলুম—

হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল করিয়া লতিকা গুপ্ত কহিল, আই-সী-এস্ হ'লে মন্দ কি? ধরুন যদি এই বছরেই—

টেব্‌লের তলা দিয়া সুপ্রভা লতিকার পায়ের উপর একটা চিমটি কাটিল। হঠাৎ লতিকা থামিয়া গেল। মুখের চেহারা তাহার বিবর্ণ হইয়া আসিল। লজ্জা পাইতে হইল,—আর একটু সংযত হইয়া কথাটা বলিলেই ভালো হইত!

সুরঞ্জন উত্তরে কেবলমাত্র কহিল, বোধহয় এলাউ করবে না! আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি;—বলিয়া উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। এক কাজ করিতে আসিয়া ইহারা আর-এক কথা বলে কেন?

ঘরের মধ্যে আর কেহ নাই। দুইটি মেয়ে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। এমন সময় একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। কে যেন গাড়ী হইতে নামিয়া অন্য পথ দিয়া অন্দরমহলে গিয়াপ্রবেশ করিল। ভিতরে কোথায় যেন একটা কি কোলাহল চলিতেছে। দুইজনে একত্র আসিয়া তবু একটু স্বস্তিবোধ করিতেছিল, কেহ একা আসিলে ভারি লজ্জায় পড়িতে হইত।

সুপ্রভা কহিল, ছুটির দিনে এত সকালে কেউ চান করে ভাই? আমি ত পারিনে! খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, না রে?

লতিকা কহিল, চেহারাটা ভালো।

ওর নাম ভালো? যেন গুণ্ডা! কাছে বসতে ভয় করে। ওই জন্যই ত' আমি একা আসতে চাইনি। দেখ্‌লি, গাউনটা কেমন? চমৎকার ফুল, না?

লতিকা কি যেন ভাবিতেছিল। কহিল, গুণ্ডা বলা উচিত নয়।

সুপ্রভা হাসিয়া কহিল, তোর বুঝি গায়ে লাগল?

যা, কাঁবলিস। ওরা যে খুব একসারসাইজ করে, শক্ত শক্ত মাস্‌ল্‌!

চুল কাটে না। একমাথা চুল।

লতিকা কহিল, কোঁকড়ানো চুল কিনা।

সুপ্রভা কহিল, কাছে এসে আজ দেখলুম, সায়েবের মতন রং, না রে? দেখ্‌লি, হাতের আঙুলগুলো?

লতিকা কহিল, কথাগুলো বড় রুক্ষ।

তা হোক।—সুপ্রভা কহিল, পুরুষ মানুষ অমনি ভালো।

মনে নেই বিজন চাটুয্যের কথা? কবিতা লিখে শোনাতে আসতো! এ রাম! এক কথা লক্ষবার। ফুল, লতা, চাঁদ আর প্রেম। ন্যাইসেন্স।

লতিকা হাসিয়া কহিল, এমনি বেশ থাকতো, কিন্তু যেই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে আসতো, অমনি কবিতাপনা,—অসহ্য য়্যাফেক্‌টেশন। মুখের চেহারাটা কি রকম হয়ে যেতো দেখেছিস?—যেন চাকর রাখলেও বাধিত হয়!

সুপ্রভা কহিল, 'দাস্যসুখে হাস্যমুখ!'

দুইটি মেয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়া খুব করিয়া হাসিতে লাগিল। বিজন চাটুয্যে হইয়া জন্মগ্রহণ করা যে কত বড় দুর্ভাগ্য তাহা তাহাদের সেই বিদ্রূপ-কুটিল হাসি না দেখিলে কিছুতেই অনুভব করা যাইবে না।

চুপ, সুরঞ্জন আসছে।

লতিকা গম্ভীর হইয়া গেল। সুরঞ্জন আসিয়া প্রথমেই কহিল, ক্ষমা করবেন, একটু দেরি হোলো আসতে। অনেকক্ষণ আপনাদের বসিয়ে রেখেছি—

দুই বন্ধু মিলিয়া জানাইল, সে জন্য আমাদের কিছুই অসুবিধা হয় নাই; বরং আপনারই কাজের সময় আমরা আসিয়া নষ্ট করিতেছি। আজ ছুটির দিন, সারাদিন এখানে থাকিলেও আমাদের ক্ষতি হইবে না। গল্প করিতে ভালোই লাগিতেছে।

সুরঞ্জন কহিল, আপনারা চা খাবেন?

দুইজনে দুইজনের মুখের দিকে তাকাইল, দুইজনেই মাথা হেঁট

করিল। খাইবার কথাটা মেয়েরা কিছুতে স্পষ্ট করিয়া প্র করিতে পারে না,—বিশেষ করিয়া পুরুষের সম্মুখে বলাটা তাহ লজ্জা ও সৌন্দর্যবোধে আঘাত করে। প্রস্তাবটা করিয়া সু নিজেই একটু অপ্রস্তুত হইল, তারপর কহিল, আপত্তি না থাক হোলো,—সকালবেলা এসেছেন—।

ঘণ্টা বাজাইতে চাকর আসিল, সুরঞ্জন তাহাকে চা আ বলিল। কোথায় যেন একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে।

সুপ্রভা এইবার কহিল, লতিকা আমার ছোটবেলা থেকেই এ'কেও আপনি সমিতির মেম্বার ক'রে নিন।

বেশ ত,—সুরঞ্জন কহিল, চাঁদা সামান্যই। মাসে এক টা মাত্র। এই বলিয়া সে ড্রয়ার খুলিয়া বিল্-বই বাহির করিল।

লতিকা এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, আচ্ছা, এই Go will Culture Association-এর functionটা কি? মা আমি ত' কিছু জানিনে, একটু বুঝে নিতে চাই।

সুরঞ্জন কহিল, এর নামটাই এর পরিচয়। কেবল ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যেই—ধরুন, কলকাতার সব কলেজগুলো একত্র হ'য়ে—

বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, ভিতরে ডাক পড়িয়াছে! সুর উঠিয়া ভিতরে গেল। বাড়ীর ভিতরে কেমন একটা অস্তভাব।

লতিকা চাপা গলায় কহিল, বেশ কথা বলে! ...তগুলো দে চিস,কেমন সাজানো? মুখের ভেতরটা লাল, বোধ হয় সিগা খায় না। যারা সিগারেট খায় আমি তাদের দেখতে পারিনে

তাহার উচ্ছ্বাস দেখিয়া সুপ্রভা একটু বিরক্ত হইল, কেন বিরক্ত হইল তাহা অনেকটা নিজেরও অজ্ঞাত। কিন্তু নিজেকে যথাসম্ভব দমন করিয়া কহিল, তুই বড় বাজে কথা বলিস, লতিকা।

লতিকা বলিল, কেন?

সুপ্রভা কহিল, Associattion-এর function কি তা কি তুই জানিসনে? ওরা বাচালতা সইতে পারেনা তা জানিস?

লতিকা কহিল, তুই ছাই বুঝিস। অমন মুখ করিস কেন বল্ ত? আমি ভাই তোমার সঙ্গে আর আসর্বো না।

একলা আসবি বুঝি কাল থেকে?

কথাটার খোঁচা ছিল, লতিকার মনটা জ্বালা করিয়া উঠিল। কহিল, তোমার গলার আওয়াজটা ভালো নয়, সুপ্রভা। আমাকে এনে বোধ হয় তোমার অনুতাপ হচ্ছে, নয়?

সুপ্রভা কহিল, তুমি আমার পাকা ধানে মই দিয়েছ কিনা; তাই অনুতাপ! তোর কথা শুনলে গা জ্ব'লে যায়, লতিকা!

লতিকা মুখের একটা শব্দ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। যেন একটা অপ্রত্যাশিত মনোমালিন্য দেখা দিতেছে; ইহার কারণ নাই, কৈফিয়ৎ নাই। আবহাওয়াটা ভারী হইয়া উঠিল।

খানিকক্ষণ পরে সুরঞ্জন আসিয়া বসিল। এবার সে গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া আসিয়াছে। হাতের আঙুলে হীরার আংটিটা জল্ জল্ করিতেছিল। হাসিয়া বলিল, আপনারা নিশ্চয়ই রাগ করেছেন, নয়?

রাগ আপনার ওপর?—লতিকা কহিল।

তাহার প্রতি সুপ্রভা অলক্ষ্যে একবার বক্রকটাক্ষ করিল
কহিল, লতিকার আর যাই থাকুক রাগ নেই, সুরঞ্জনবাবু।

লতিকাও ছাড়িল না। কহিল, রাগটা ত ভাই তোম
একচেটে, সুপ্রভা ?

সুরঞ্জন আবার হাসিল। কহিল, এত খোঁচাখুঁচি কেন ?

সুপ্রভা বলিল, বন্ধুত্ব! মেয়েরা হ'চ্ছে থালা-বাটির মত
কাছাকাছি থাকলেই ঠোকাঠুকি লাগে।

তিনজনে মিলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। হাসি জিনিষটা ব
ছোঁয়াচে।

এমন সময় বেয়ারা চা লইয়া আসিল, তাহার সহিত প্রচুর জ
যোগের সামগ্রী। আয়োজন দেখিয়া দুইজনেই লজ্জিত হইল
সম্মুখে গোলাকার একখানা কাঁচ-বসানো বড় টিপাই ছিল, সে
টানিয়া বেয়ারা তাহার উপর সেগুলি সাজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল
মিনিটখানেক পরে পুনরায় আসিয়া দুইটা ভিজা স্পঞ্জ হাত পরিষ্
করিবার জন্য রাখিয়া দিল।

তাহাদের লজ্জা দেখিয়া সুরঞ্জন কহিল, আপনাদের আ
অবস্থাটা দেখে আশ্চর্য হ'চ্ছি, এমন নিরীহ আপনারা জানতুম না
খান, চা আপনাদের ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

দুইজনে বলিল, এত জলখাবার দিলেন যে ?

সুরঞ্জন হাসিয়া কহিল, আমার দেবার কথা, দিলুম ; কি
আপনারা যদি না খান্ কি করতে পারি বলুন ?

আবার গাড়ী করিয়া কাহারা যেন আসিল। ঘরের ভিতরে বসিয়াই সুরঞ্জন কাহার দিকে যেন চাহিয়া হাসিয়া নমস্কার করিল। কিন্তু বাহির হইতে ডাকাডাকির জন্য তাহার বসা হইল না, উঠিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে হইল। যাইবার সময় বলিল, আপনারা খান্, আমি আসছি।

অগত্যা তাহাদের খাইতে হইল। প্রথমে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া সুপ্রভা কহিল, ব্রাউন্ শাড়ীটায় তোকে কিন্তু খুব মানিয়েছে, লতিকা।

ডিমভাজা মুখে পূরিয়া লতিকা কহিল, তোমার মতন চেহারা হ'লে কিছুই সাজবার দরকার হয় না ভাই।

কী ভাই তুমি ? আমার আবার ভালো চেহারা তুমি কোথায় দেখলে ? বৈদ্য মেয়েদের আবার রূপ !—সুপ্রভা একখানা কেক খাইল। মনে ভাবিল, এই শাড়ীটা না পরিয়া আসিলেই ভালো হইত !

লতিকা কহিল, তোমার কত ভালো-ভালো সম্বন্ধ এসেছে, তুমিই বরং তাদের পছন্দ করলে না। আমার কথা ? আমাকে চিরকাল চাকরী ক'রে মরতে হবে—এই বলিয়া সে খাবার ছাড়িয়া চা খাইতে মন দিল।

সুপ্রভা কহিল, তোমার ভাই চাকরি করা সখ। তোমার বাবা কত বড়লোক। তুমি নিজে রোজগার ক'রে চালাতে চাও, সেই জন্যই ত—

তুমিও ত টুইশনি করো ভাই ?

কি করব বল্, হাত খরচের টাকা বাবার কাছে চাওয়া যায়৷ এম্-এটা ভাল ক'রে পাশ করতে না পারলে আমার অনন্ত দুর্গা

লতিকা কহিল, আয়, বিয়ে করা যাক্।

কা'কে ?—বলিয়া সুপ্রভা হাসিল।

চট্ করিয়া লতিকা মুখ ফিরাইয়া লইল। কেন জানিনা হঠা তাহার সমস্ত মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। মনে হইল, একটু এব করিয়া নিজেরা যেন নিজেদের নিকট ধরা পড়িয়া যাইতেছে মেয়েদের চিত্তদৌর্বল্য মেয়েরা বড় বে সহজে ধরিয়া ফেলিতে পারে

সুপ্রভা কহিল, এই সমিতিটাকে যদি ভালো ক'রে আমর গড়তে পারি—

লতিকা কহিল, ধোৎ তোর সমিতি। কিছুই ভাল লাগে না কী ছাই হবে এম-এ পাশ ক'রে? মাষ্টারী? রিসার্চ স্কলার লাভ কি? চাকুরি করতে আমার ভালো লাগে না। আমাদে নমিতা মিত্র বেশ ভাল স্কোর্ করেছে, না রে?

সুপ্রভা কহিল, বরটা ভাল। খুব ইয়াঙ। টাকাও আ অনেক। সত্যি, ব'সে না খেলে আরাম নেই।

লতিকা কহিল, আচ্ছা, সুরঞ্জনের পক্ষে কি রকম মেয়ে মানায়

সুপ্রভা অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর বলিল, জানি ভাই। ওর যোগ্য মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে? তা ছাড় আমার মনে হয়, স্বামী বেশি রূপবান হ'লে স্ত্রীর বড় যন্ত্রণ। কোথা গেলে স্বস্তি নেই।

লতিকা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। কহিল, বলেচিস ঠিক

যতই লেখাপড়া শিখি, আদিম প্রকৃতি বদলায় না। আচ্ছা সুরঞ্জন কেমন ছেলে?

সুপ্রভা লুকাইয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিল। দুইজনেই চতুর। অত্যন্ত সন্তর্পণে একজন আর একজনের সহিত কথা বলিয়া যাইতেছে। সুরঞ্জনের সমুখে এতক্ষণ ধরিয়া একজন অপরজনকে ছাপাইয়া নিজের উৎকৃষ্ট পরিচয়টিই প্রকাশ করিয়াছে,—চেহারায়, পোষাকে এবং ভাবভঙ্গীতে। দুইজনেই জানে, এই ছেলেটির পছন্দসই হইয়া উঠিবার জন্ম তাহাদের চেষ্টার আর অন্ত নাই! সুপ্রভা চুলের লকগুলি হাত দিয়া ঘুরাইয়া ঠিক করিয়া লইল, লতিকা সিল্কের রুমাল দিয়া মুখ মুছিল।

কই, উত্তর দিলি না যে?

সুপ্রভা সংক্ষিপ্তভাবে কহিল, ওর মেজাজটা খুব ভালো!

লতিকা কহিল, মনটা আরো ভালো।—বলিয়া সে ঘরের ভিতরকার বহুমূল্য সাজসজ্জার দিকে তাকাইতে লাগিল। নিজের কথা নিজেই যেন গায়ে মাখে নাই।

সুপ্রভা কহিল, চেহারাটা তার চেয়েও ভালো!

দুই বালবন্ধু মুখে চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়িল। অজ্ঞানে যে তাহারা কতদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল তাহা নিজেরাই বুঝিতে পারিল না। যে-কাজের জন্ম এখানে তাহাদের আবির্ভাব তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, আগ্রহ নাই,— রুচিও যে কিছু আছে এমনও তাহাদের [illegible] দেখিয়া আভাস পাওয়া যায় না।

লতিকা বলিল, তুই মরেছিস, সুপ্রভা। তুই উচ্ছন্নে গেছিস।

সুপ্রভা ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিল, যেন তুইই বেঁচে আছিস!

যে-চেয়ারখানায় সুরঞ্জন বসিয়াছিল তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া লতিকা বলিল, আমার অত লোভ নেই, ভাই। আমি—

সুপ্রভার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। মুখ অন্ধকার করিয়া কহিল, লোভ নেই তাই মেম্বার হ'তে এসেছিস, কেমন? কাল রাত্রে কী বলেছিলি? বেশি বরফট্টাই করিসনে, জানি সব।

আঘাত খাইয়া লতিকা গরম হইয়া উঠিল, কহিল, আর তুমি? তুমি কাল বলোনি যে, সুরঞ্জনের সমিতির জন্য সব এনার্জি চাল্‌বে? কেন? হঠাৎ Goodwill Culture Association-এর ওপর তোমার এত দরদ উথলে উঠ্‌ল কিসের জন্যে? হিপোক্রিট্‌!

থাম্‌ লতিকা—সুপ্রভা চাপা গলায় কহিল, তোর কেবল high sounding sermons. তোমার এই সুরঞ্জনটি কেমন, শুনি? মনে নেই চার মাস আগেকার কথা? করিডরে দাঁড়িয়ে নীলিমা চৌধুরীর সঙ্গে হেসে-হেসে আলাপ! ভুলে গেছিস্‌, না? মনে পড়লে আজো গা জ্ব'লে যায়।

লতিকা কহিল, ভদ্রভাবে কথা কইতে গেলে মুখে অমন একটু হাসি লেগেই থাকে। তোমার নীলিমা চৌধুরীই বরং মন-ভোলাতে অদ্বিতীয়।

সে মন-ভোলাতে যাবে কেন? অমন সুন্দর রূপ তার,—তার কাছেই বরং ছেলেরা···মানে বিজন চাটুয্যে এণ্ড কম্প্যানি—

যাক্‌গে নালিমার কথা; পাশ ক'রে বেরিয়ে গেছে।—এই যে, আসুন, বোধহয় খুব জ্বালাতন করছি আপনাকে। অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণ···আপনি ভারি শান্ত, সুরঞ্জনবাবু। এত নিরীহ ব'লেই আপনি প্রেসিডেন্ট্ হ'য়েছেন।

সুরঞ্জন হাসিতে হাসিতে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর বলিল, ভারি ব্যস্ত ক'রে রেখেছে আমাকে। দেখুন না, দু'দণ্ড বসতেই দেয় না।

সুপ্রভা কহিল, তা হোক, আপনাদের বাড়ীর লোকরা খুব ভালো!—এই বলিয়া সে টেবিলের উপর তাহার সুন্দর দুইখানা হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

লতিকা এই সুযোগ ত্যাগ করিল না, সুপ্রভা তাহাকে অনেক খোঁচাইয়াছে। তাহার হাত রাখার ভঙ্গীটা দেখিয়া মনে মনে সে হাসিল, তারপর গভীর বিদ্রূপের সঙ্গে তাহার প্রতি নির্দেশ করিয়া কহিল, বুঝলেন সুরঞ্জনবাবু, she finds interest in your inner house!

সুরঞ্জন উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার সহিত হাসিল লতিকা। এই দুইজনের মুখভরা হাসি দেখিয়া সুপ্রভাও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো একটু হাসিল। কহিল, লতিকা, you are positively silly to day.

তাহার রাগ দেখিয়া আবার দুইজনে হাসিয়া উঠিল।

সুরঞ্জন বলিতেছিল, functionটা এককথায় এখুনি বোঝানো কঠিন। তবে এ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরই ইন্টারেষ্ট্; একটা বড়

সমাজ তৈরী করা, প্রকাণ্ড একটা পরিবার, সকলের সঙ্গে সকলের —কই আপনারা বোধহয় শুনচেন না আমার কথা—

শুনচি বৈ কি, কী আশ্চর্য!—লতিকা বলিল।

সুপ্রভা বলিল, ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারেষ্ট, মানে? তারা কী পাবে? মানে, materially—

সুরঞ্জন হাসিয়া কহিল, পাওয়ার কথা কিছু না, কেবলই দিয়ে যাওয়া। Goodwill Culture-এর গোড়ায় রয়েছে স্বার্থত্যাগ। ধরুন প্রতি বছরে যে হাজার হাজার ছাত্র আর ছাত্রী বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের সুখদুঃখের সংবাদ রাখা,—এর নাম ইন্টারেষ্ট, এরই নাম স্বার্থত্যাগ—

একজন চাকর আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাকে টেলিফোনে ডাকচেন। বিশেষ জরুরী—

লতিকা হাসিয়া কহিল, আপনার absence অনেক সহ্য করেছি, সুতরাং এটাও গায়ে লাগবে না। শীঘ্র যান—

চাকরটা কহিল, দাদাবাবু, তাঁরা এখুনি আসবেন। আপনি তৈরী হ'য়ে—

তুই যা নিজের কাজে। বলিতে বলিতে সুরঞ্জন বিরক্ত হইয়া চাকরের অনুসরণ করিয়া ভিতরে গেল। আজ তাহাকে লইয়া কেমন যেন টানাটানি পড়িয়া গেছে।

তাহার পায়ের শব্দ মিলাইবার পর সুপ্রভা কহিল, তুই ভারি কিপ্‌টে। সব না শুনে টাকাটা দিবিনে, কেমন? কোরি বক্তৃতা দিয়ে সারা হোলো।

লতিকা কহিল, আহা, তোর বুঝি গায়ে লাগছে? ওরে বাবা, এত?

গায়ে লাগবে কেন ভাই? যখন কথা বলে, দেখেছিস, কী প্যাশন্!

লতিকা চুপ করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, কী যে বললে কিছুই শুনিনি—বলিয়া চাপা নিশ্বাসটা ধীরে ধীরে ফেলিল।

সুপ্রভা হাসিয়া কহিল, আমাকে বল্‌ছিলি, কিন্তু তুই সত্যি মরেছিস, লতিকা।

কৃত্রিম বিষাদ প্রকাশ করিয়া লতিকা কহিল, এর পরে বেঁচে থেকে বিশেষ লাভও নেই!

সুপ্রভা কহিল, আমি ভাই খুব খাটবো সমিতির জন্য।

লতিকা কি করিবে তাহা কোনমতেই জানাইল না, অনেকটা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিল। জানে, কোনরূপ আগ্রহ দেখাইলে সুপ্রভা তাহার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করিতে পারে। খাটিবার কথা বলিয়া তাহার মন জানিবার চেষ্টা! সুপ্রভা বড় ধূর্ত! দুপুরের দিকে লতিকা সুরঞ্জনের নিকট আসিয়া সমিতির সম্বন্ধে কথা কহিবে, কারণ, দুপুরবেলা সুপ্রভা টিউশনি করিতে যায়। মনে মনে লতিকা একটা প্লট আঁটিল। সুপ্রভা ওদিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিতেছিল, লতিকাকে এখানে আনা ভাল হয় নাই, এইবার হইতে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে হইবে, নহলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। শকুনির মতো ওর স্বভাব।

গেটের ভিতরে আবার একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল ভিতর হইতে যে-মেয়েটি হাসিমুখে নামিয়া আসিল, তাহাকে দেখিয় লতিকা ও সুপ্রভা যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আরে, এ যে নীলিমা চৌধুরী!

নীলিমা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া আহ্লাদে দুইজনকে জড়াইয়া ধরিল।

সুপ্রভা কহিল, কতদিন পরে দেখা। কী সুন্দর তোমাকে দেখতে হয়েছে নীলিমাদি? আমাদের সমিতির মেম্বার হবে ত? এখানে এলে যে?

নীলিমা হাসিতে হাসিতে কহিল, কাজ আছে গো, অনেক কাজ—

লতিকা ও সুপ্রভা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল। লতিকা কহিল, আমি ভাই এসেছিলুম মেম্বার হ'তে!—এঁরা বুঝি তোমার আত্মীয় হন?

মুখ টিপিয়া নীলিমা কহিল, বিশেষ আত্মীয়!

অনেকগুলি গলার আওয়াজ পাইয়া সকলে চুপ করিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ভিতর হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া নীলিমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আলাপে জানা গেল, সুরঞ্জনের সহিত নীলিমার বিবাহ! সুরঞ্জন আগামী কাল সংবাদপত্রে ইন্‌গেজমেণ্ট এনাউন্স করিবে।

স্তম্ভিত, বিমূঢ়—ঝড়ের ফুৎকারে দুইটা প্রদীপ যেন দপ্ করিয়া নিবিয়া গেছে। তাহারা নীলিমাকে লইয়া সবাই ভিতরে চলিয়া

গেল। ইহার পরে আর অপেক্ষা করা চলে না। কী জন্য অপেক্ষা করিবে? সৌজন্য ও ভদ্রতা? ওটা অনেক হইয়াছে, আর না। দুইজনে যন্ত্রচালিতের মতো বাহির হইয়া আসিয়া গেট্ পার হইয়া রাস্তায় পড়িল। দুইজনকে যেন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে; তাহাদের সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে। কেমন একটা প্রবল বিতৃষ্ণা ও বিশ্রী আত্মগ্লানিতে সুপ্রভার চোখে জল আসিতেছিল, কিন্তু তাহা চাপিয়া সে মুখে হাসি টানিয়া কহিল, রিডিকুলাস্!

লতিকা নিঃশব্দে চলিতেছিল, এইবার পথের মাঝখানে কাপড় চাপা দিয়া উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিয়া কহিল, নোংরামি!

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত



যে পৃথিবীতে আপনি বাস করে
ছবিটা কখনো মানসপটে কল্পনা ব
কি? ক্ষুধাতুর রুগ্ন এবং বিকলা
পৃথিবী, রোগমসীঢালা কুৎসিত
লোলুপ তার দেহ, দুর্নীতি আত্মগ্লা
স্বেচ্ছাচারে তা মৃতকল্প। পৃথিবী
যে চিত্র—এটা ভয়ঙ্কর হ'লেও
"দুই আর দু'য়ে চার" উপন্যাস
মধ্যে আছে সেই ভয়ঙ্কর ও
সত্যের প্রকাশ। দাম-



আপনি কি জানেন, শিক্ষিতা ও আলোকপ্রাপ্তা ভদ্রমহিলার অঙ্গাভরণের নীচে কি লজ্জাকর দৈন্য, কি করুণ আত্মপ্রতারণা, ব্যর্থতার কি মর্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস?

দাম—২॥০

— প্রবোধকুমারের অন্যান্য গ্রন্থ —

নবীন যুবক ২॥০ তরুণী-সঙ্ঘ ১।

কলরব ১।০ অবিকল ১।০ দিবাস্বপ্ন ২

প্রিয়-বান্ধবী ৩৲ ঘুম ভাঙার রাত ১॥

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট — কলিকাতা